# স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ১৮ মার্চ - ২০১৩।। ৪ চৈত্র - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

## উত্তাল বাংলাদেশ, আতঙ্কিত হিন্দু

# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

মমতা কি চান— গণতন্ত্র না দলতন্ত্র? □ ৯

খোলা চিঠি : লাগে টাকা, দেবে রং-তুলি □ সুন্দর মৌলিক □ ১০

বাজেট, না বার্ষিক অভিশাপ □ অম্লান কুসুম ঘোষ □ ১১

সাম্প্রদায়িক হামলা চলছে বাংলাদেশে—
কি বার্তা নিয়ে গেলেন প্রণববাবু? □ ১৩

যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি নিয়ে বাংলাদেশে তাণ্ডব
এবারেও টার্গেট হিন্দুরা □ ১৫

বাংলাদেশ কি গৃহযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে? □ ধীরেন দেবনাথ □ ১৭

ভাবনা-চিন্তা : অশনি সংকেত □ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে □ ২০

তারকনাথের আগে বাবা লোকনাথ □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২১

অন্তর্মুখী সাধক □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২

প্রযুক্তির বেশে আধ্যাত্মিকতা □ নীতিন রায় □ ২৩

আইনে নারীর অধিকার □ অরুণা মুখোপাধ্যায় □ ২৬

নির্বাসিত কাশ্মীরী পণ্ডিতদের এক রক্তাক্ত দলিল □ রাজেশ সিংহ □ ২৭

রেল বাজেট -২০১৩-১৪ : পবন হাওয়া এবার ঘুরল
রায়বেরিলিতে □ তারক সাহা □ ২৯

অপহৃতা ছাত্রীর উদ্ধারের দাবিতে মালদার
কালিয়াচকে থানা ঘেরাও □ ৩১

অন্য চোখে : জন্মেজয় বৈশম্পায়ন সংবাদ

অথ বিষয় ধর্মঘট □ কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী □ ৩২

অন্যরকম : আধ্যাত্মিক সংগ্রহশালা □ বিরাজ রায় □ ৩৪

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ সু-স্বাস্থ্য : ৩৫ □

সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ খেলা : ৪১


প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উত্তাল বাংলাদেশ, আতঙ্কিত হিন্দু
পৃঃ ১৩-১৮


সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ৪ চৈত্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৮ মার্চ - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।



দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২



**Postal Registration No.-**
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57



দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

# স্বস্তিকা

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## কপ্টার কেলেঙ্কারি

১৯৮৬তে বোফর্স কামান কেনার সময় দালালির তথ্য উঠে এসেছিল। তখনও কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেস সরকার, আজও কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ জমানার নিত্যনতুন দুর্নীতির মধ্যে সম্প্রতি আবার ভি আই পি-দের জন্য হেলিকপ্টার কেনায় দালালচক্রের হদিশ মিলেছে। বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহায়তায় প্রতিরক্ষা এবং আমলাতন্ত্রের এই দুর্নীতি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন— **মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়, নীতিন রায়** প্রমুখ।

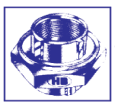

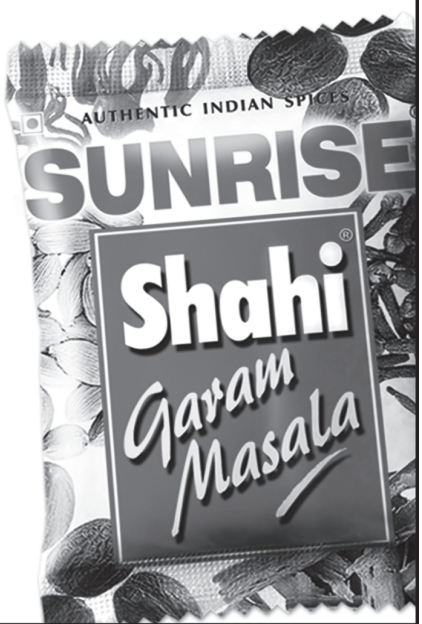

*।। সত্বর কপি বুক করুন।।*

# সম্পাদকীয়

## হিন্দু সুরক্ষাই সুসম্পর্কের প্রধান শর্ত

শাহবাগ চত্বরে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে জামাত-রা আবার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। মুক্তি যুদ্ধের পর গত চার দশক ধরিয়া জামাত-ই-ইসলামি পাকিস্তানী পৃষ্ঠপোষকদের সমমনোভাবাপন্ন সংগঠন হিসাবে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। বাংলাদেশকে তালিবানী পাকিস্তানে পরিণত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। জামাত নেতারা রাজনৈতিক ইসলামের পশ্চাৎমুখী ধ্যানধারণা মূল সমাজের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে নিরন্তর চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। তাই ইহা কোনও বিস্ময়ের বিষয় নয়, যখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একাত্তরে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে জামায়াত-ই-ইসলামির নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদির মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হইবার পর জামাত বাংলাদেশে ব্যাপক হামলা শুরু করিয়াছে। বিরুদ্ধবাদী ও পুলিশের সহিত শুধু তাহারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই, এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদের ওপর হামলাও চালাইয়াছে। হামলা শুরু হওয়ার পর হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় দুই হাজার হিন্দুর বাড়িঘর ও দোকানপাট এবং শতাধিক মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও আগুনে পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘটনা হইল, কোনও না কোনও অজুহাতে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর এই ধরনের ব্যাপক হামলা হইয়া আসিতেছে। ১৯৯০, ১৯৯২ এবং ২০০১ সালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এইরূপ ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা হইয়াছিল। মূল লক্ষ্য হিন্দুদের বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করা। এইসব হামলার ফলে বাংলাদেশে হিন্দুদের হার প্রায় নয় শতাংশে নামিয়া আসিয়াছে। সাম্প্রতিক ঘটনায় অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বাংলাদেশের একাংশ অতীতের ক্ষতে প্রলেপ লাগাইবার প্রচেষ্টা করিলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নাই। একাত্তরের ভূত বাংলাদেশকে গ্রাস করিতে বারেবারে হানা দিতেছে।

এইবারে হামলা হইয়াছে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সফরের সময়। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রীয় সফরের তিনদিনই টানা হরতাল চলিয়াছে। সেখানকার বিরোধী দলনেত্রী খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির সহিত সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করিতেও অস্বীকার করিয়াছেন। এমনকী আওয়ামি লীগ সাংসদরাও হামলার সময় হিন্দুদের পাশে দাঁড়ায় নাই বলিয়া স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ। অথচ বাংলাদেশের হিন্দুদের আওয়ামি লীগ সমর্থক বলিয়া মনে করা হয়। প্রণববাবু বাংলাদেশের ধর্মান্ধ শক্তির বার্তা কি পাইয়াছেন?

এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে ভারতকে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করিতে হইবে যাহাতে বাংলাদেশ সুনিশ্চিত করে যে এইরূপ ঘটনা তাহাদের সীমার মধ্যে আর কখনও ঘটিবে না। হাসিনা সরকারকে এমন দৃঢ় ভাবে জামাতের মোকাবিলা করিতে হইবে যে তাহাদের কালো হাত আর কখনও উঠিতে না পারে, এমনকি পাকিস্তানী সমর্থকরাও যখন সরকারে থাকিবে।

বস্তুত ঢাকার শাহবাগ চত্বরে জনজোয়ারে যে তারুণ্যের প্রাধান্য, অরাজনৈতিক সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহা এই আশংকার প্রতিবাদেই সোচ্চার। এই কথা সত্য, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারই আন্দোলনকারীদের মুখ্য দাবী, কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে জামাত-ই-ইসলামি এবং ইহার নগ্ন ইসলামিক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করা তাহাদের অন্যতম প্রধান দাবী। প্রশ্ন হইল, বিশ্বের উম্মাহদের (Ummah) বিরোধিতা সত্ত্বেও কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে মুসলিম অধ্যুষিত তুরস্ক যাহা পারিয়াছিল নবীন প্রজন্মের সহযোগিতায় বর্তমান বাংলাদেশ তাহা করিতে পারিবে না কেন? মুক্তি যুদ্ধে ভারত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াইয়াছে, সেই দেশের বিকাশেও তাহার পাশে দাঁড়াইতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহার আগে শেখ হাসিনা সরকারকে সুনিশ্চিত করিতে হইবে যে আর কখনও সেখানে হিন্দু নির্যাতন, হত্যা, হিন্দুনারী ধর্ষণ, হিন্দু সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠন বরদাস্ত করা হইবে না। বাংলাদেশ হইতে হিন্দু বিতাড়ন চলিবে না। বাংলাদেশী মুসলিমদের ভারতে ঢুকাইয়া বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের খোয়াব দেখা চলিবে না। বাংলাদেশকে জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর করিতে দেওয়া চলিবে না। সুরক্ষিত হিন্দুই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রধান শর্ত—ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে।

## জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*এসো, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখো, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেয়ো না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।*

*—স্বামী বিবেকানন্দ।*

# পাকিস্তানে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের দুর্দশায় স্তম্ভিত বৃটিশ এম পিরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** সত্যজিতের এক ডজন গল্পের মতো পাকিস্তানে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ওপর নির্মম অত্যাচারের কয়েক ডজন কাহিনী শুনে হতবাক হয়ে গেলেন বৃটিশ পার্লামেন্টের একদল প্রভাবশালী সদস্য। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা লন্ডনস্থিত মানবাধিকার কর্মী জেসবীর উপ্পলকে এই মর্মে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। তাঁরা আরও জানান, লিখিত প্রমাণগুলি পেলেই তাঁরা পাকিস্তানের উপর এই সূত্রে চাপ সৃষ্টি করবেন।

সম্প্রতি লন্ডনে অল পার্লামেন্টারী গ্রুপ অন পাকিস্তান ও একই ক্ষমতা সম্পন্ন ধর্মসংক্রান্ত দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলের কাছেই শ্রী উপ্পল প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই সূত্রে তিনি কারগিল যুদ্ধে শহিদ ক্যাপ্টেন সৌরভ কালিয়া, সর্বজিৎ সিং, সেপাই যশপাল সিং-এর নাম উল্লেখ করেন। চামেল সিং-এর ঘটনা উল্লেখ করে উপ্পল ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, চামেল পাকিস্তানী কারাগারে মারা গেলেও ভারত এখনও তার দেহ পায়নি।

সর্বজিত সিং

সৌরভ কালিয়া

ওয়েস্ট মিনিস্টারের বৃটিশ পার্লামেন্টে হওয়া এই সাক্ষাৎকারে সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে এম পি-রা ১৫ বছরের এক ভারতীয় কিশোরের ৮ বছর আগে নিখোঁজ হওয়ার পর সম্প্রতি পাকিস্তানী জেলে আবিষ্কৃত হওয়ার ঘটনায় আশঙ্কা ও তীব্র হতাশা ব্যক্ত করেছেন। সংবাদসূত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শ্রী উপ্পল পাকিস্তানে জেলবন্দী ভারতীয়দের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের এমন জঘন্য ঘটনায় বৃটিশ এমপিদের তীব্র ক্ষোভের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এই মর্মে উপ্পল উপযুক্ত লিখিত প্রমাণগুলি তাঁদের হাতে তুলে দিলে তাঁরা অবিলম্বে যে সমস্ত বন্দীরা দীর্ঘদিন পাকিস্তানের জেলে বন্দী আছেন তাদের দ্রুত মুক্তির ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করবেন এমনই আশ্বাস দিয়েছেন। এর আগে কারগিল শহীদ সৌরভ কালিয়ার বাবা বিজ্ঞানী এন কে কালিয়া এই উপ্পলকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে মানবাধিকার সংক্রান্ত দপ্তরে তাঁর নিহত পুত্রের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তুলে দিয়েছিলেন।

উপ্পলকে উদ্ধৃত করে সংবাদসূত্র জানাচ্ছে যে ইতিপূর্বে পাকিস্তান ৩২ জন যুদ্ধবন্দীকে প্রত্যার্পণের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে মাত্র ৬ জনকে ফেরত পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৯৯ সালের মে মাসে রুটিন সুরক্ষা পরিদর্শনের কাজে ক্যাপ্টেন কালিয়া তাঁর অন্য পাঁচ সঙ্গীসহ কাকসার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা সেখান থেকেই তাদের বন্দী করে ২২ দিন ধরে অমানবিক অত্যাচার চালায়। ১৯৯৯ সালের ৯ জুন ফেরত পাওয়া তাদের ক্ষতবিক্ষত, গলিত মৃতদেহগুলির শরীরে সেই অত্যাচারের প্রমাণ মেলে। সি এস আই আর-এর অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিজ্ঞানী প্রয়াত ক্যাপ্টেন কালিয়ার বাবা ইন্টারন্যাশানাল ফোর্স অফ জাসটিসে (হেগে অবস্থিত) তাঁর সন্তানের ওপর অত্যাচারের বিচার চান। এই সূত্রে তিনি ইতিমধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ মেল ও ৪২ হাজার চিঠি পেয়েছেন।

এবিষয়ে বিদেশ দপ্তরের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।

## ক্যানিং-এর ঘটনা নিয়ে আদালতের তদন্তের নির্দেশ

**সংবাদদাতা॥ সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার নলিয়াখালি ও তার আশপাশের কয়েকটি গ্রামে মুসলিম দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে। এতে দুটি গ্রামের বেশিরভাগ ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাসিন্দারা হয় সর্বস্বান্ত। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা উচ্চ আদালতে কৃশানু মিত্র একটি জনস্বার্থ মামলাদায়ের করেন। উচ্চ আদালতে প্রধান বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে গত ৭ মার্চ, ২০১৩ এই মামলার শুনানি হয়। সেখানে উচ্চ আদালতের এই বেঞ্চ রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিকে উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের দিয়ে ঘটনাটির বিস্তারিত তদন্ত করিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেয়।**

## হিন্দু জাগরণ মঞ্চের আবেদন

**ভাইয়ের রক্ত, বোনের লজ্জা, মায়ের কান্না ভুলে আমি কি খেলবো হোলি?**

**বাংলাদেশ, দেগঙ্গা ও ক্যানিং-এর নির্যাতনের প্রতিবাদে হিন্দু সমাজের কাছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের আবেদন।**

# তিস্তা শীতলবাদের প্রাক্তন সঙ্গী এখন নিজেদের বিরুদ্ধেই পুনর্তদন্ত চাইছেন

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** সমাজকর্মী তিস্তা শীতলবাদের পূর্বতন সহকর্মী রইস খান পাঠান গত সপ্তাহে তাঁর এবং তিস্তা শীতলবাদের বিরুদ্ধে চলা একটি পুলিশি তদন্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের দেওয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে পুনরায় নিজের বিরুদ্ধেই মামলা চালানোর অনুমতি চেয়ে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন জানিয়েছেন। এই ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে মামলাটি এগিয়ে নিয়ে গেলে ২০০২ সালে গোধরা দাঙ্গা সংক্রান্ত মিথ্যা প্রমাণ ও সাক্ষীসাবুদ জোটানোর অপরাধে শ্রীমতী শীতলবাদের বেশ ভালরকম ফেঁসে যাওয়ার সম্ভবনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সর্বোচ্চ আদালত রইস পাঠান ও শীতলবাদের বিরুদ্ধে নারোদা গ্রামের ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কিত মামলার তদন্তটির অগ্রসর হওয়ার ওপর স্থগিতাদেশ দেন। এখানে উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ১১ জুলাই গুজরাট হাইকোর্ট এই তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছিল। শ্রীমতী শীতলবাদ তাঁর বিরুদ্ধে আনা প্রমাণ বানচাল করা ও মিথ্যে সাক্ষী জোটানোর অভিযোগকে আড়াল করতেই সর্বোচ্চ আদালতে স্থগিতাদেশের মামলা করেন। ২০১১-র ২ সেপ্টেম্বরে সর্বোচ্চ আদালতে বিচারক আফতাব আলমের বেঞ্চও সেই আবেদন মঞ্জুর করায় শীতলবাদের বিরুদ্ধে তদন্ত থমকে যায়। ২০০২ সালে গুজরাট কাণ্ডের পর সিটিজেন্স ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস (সি জে পি) নামে গঠিত এই সংস্থার কর্ণধার শ্রীমতী শীতলবাদ। রইস খান পাঠান তাঁর সহযোগী ছিলেন।

*তিস্তা শীতলবাদ*

এই প্রসঙ্গে পাঠান স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের কারণ হিসেবে মামলার প্রয়োজনীয় নথিপত্র লোপাট, প্রমাণ লোপ, সাক্ষীদের ভয় দেখানো, বেআইনী প্রভাব খাটানোর আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। পাঠান তাঁর আবেদনে এই তদন্তে নিজে যোগ দেওয়ার সদিচ্ছা প্রকাশ করে এর পেছনে অনেক বড় চক্রান্তকে সামনে আনা ও সঠিক সত্য উদ্ঘাটনে সবরকমের সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি ভিন্ন আবেদনে বিচারক আফতাব আলমের এজলাস থেকে মামলাটিকে স্থানান্তরিত করারও তিনি জরুরি মনে করেন। কারণ হিসেবে তিনি আলমের পক্ষপাতী হয়ে পড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন, সম্প্রতি বিচারপতি আলম লন্ডনে বহুত্ববাদ সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট একটি সংস্থায় (পি পি কে পি) বক্তব্য রাখতে যান। যেখানে তাঁর কন্যা (আলমের) সরাসরি জড়িত। এছাড়া আলমকন্যা গুজরাট দাঙ্গা বিধ্বস্তদের জন্য গঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার শীর্ষস্থানীয়া।

প্রসঙ্গত আমেদাবাদের অতিরিক্ত দায়রা বিচারালয়ে রইস খান পাঠান সি আর পি সি-র ৩১১নং ধারায় নারোদা পাটিয়া কেসে তাকে রাজসাক্ষী করার আবেদন জানালে আদালত তা নাকচ করে দেয়। ৩ ডিসেম্বর ২০১০-এর এক আদেশে আমেদাবাদ সিটি মিডিল কোর্টের ও দায়রা আদালতের রেজিস্ট্রারদের রইস পাঠান ও শীতলবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলেন। এই অপরাধগুলি মূলত মিথ্যে প্রমাণ দাখিল ও বানানো সাক্ষ্য দেওয়া সংক্রান্ত। শ্রীমতী শীতলবাদ যে সর্বোচ্চ আদালতে এই তদন্তের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জোগাড় করে পিঠ বাঁচাতে চাইছেন তা পরিষ্কার।

# ভারতের সেবাই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা : মোদী

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** প্রায় ১২৫ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— অন্যসব দেবী-দেবতাদের ভুলে গেলে

ক্ষতি নেই, আগামী ৫০ বছর আমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হোক--- 'ভারতমাতা'। মার্কিন প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে স্বামীজীর সেই কথারই প্রতিধ্বনি শোনালেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বললেন, তাঁর কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাটা খুব সরল। আগে এবং সবার আগে ভারত। ভারতের সেবা করে ভারতের উন্নতি করার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। ভারতের সেবাই আমাদের সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহলেই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের রক্তে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবাহিত হবে।

তিনি শিব-পার্বতীর সংসারের অনুপম উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, সাধারণের বিশ্বাস, সাপ ইঁদুর খায়। শিবের গলায় সাপ ও গণেশের বাহন ইঁদুর একসঙ্গে রয়েছে। এটা হলো সহাবস্থানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতকে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ করার সবকিছুই আমাদের আছে— আমরা তা করতে পারি, আমরা তা করব। তিনি আরও বলেন, গুজরাটের ১২/১৩ বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, বিকাশ মন্ত্রই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। গুজরাটের ভোটাররা উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। যেখানেই আমরা থাকি আমাদের মূল— আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আমাদের ভারতপ্রেম ও ভারতভক্তি যেন অবশ্যই থাকে।

# বেআইনি জমি কেনায় বঢ়রাকে বাঁচাতে উদ্যোগী গেহলট সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে ইতিপূর্বে সন্দেহজনক জমি-চুক্তির কারণে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিলেন ইউ পি এ সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট বঢ়রা। সম্প্রতি তিনি জড়িয়ে পড়লেন আরও একটি বিতর্কে। গত ৭ মার্চ ইংরেজি নিউজ চ্যানেল

*বঢ়রা*

'হেডলাইনস টু ডে' দাবি করে যে আইনের তোয়াক্কা না করে রাজস্থানে নির্ধারিত জমি-সীমার অতিরিক্ত জমি কিনেছেন রবার্ট। চ্যানেলটি বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছে বিকানীর অঞ্চলের অনুর্বর বিস্তৃত জমি কিনতে অশোক গেহলট সরকারের আইন সংশোধনের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন সংশোধনের আগেই রবার্ট জমি কিনেছিলেন বলে চ্যানেলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। চার ক্ষেপে রবার্ট প্রায় ৩২১.৭৮ একর জমি কেনেন। যা আইন সংশোধনের পূর্বে জমির ঊর্ধ্বসীমা ১৭৫ একরের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, রবার্টকে বাঁচাতেই কি শেষ পর্যন্ত আইন সংশোধনের রাস্তায় গেল গেহলট সরকার।

চ্যানেলটিতে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, বিকানীরের বস্তী চুয়ানন গ্রামে মহেশ নাগরের নামে ২০০৯ সালে ২১৮ একর জমি কেনেন রবার্ট। দ্বিতীয় বিশাল পরিমাপের জমিটি কেনা হয় গজনীর গ্রামে। ২০০৯-এর ৪ জুন এখানে বঢ়রা ৩৬ একরেরও বেশি জমি কেনন। জমি-চুক্তিতে দেখা যাচ্ছে ব্লু ব্রিজ প্রাইভেট ট্রেডিং কোং-এর পক্ষে মহেশ নাগর ওই জমিটির অধিকারী হন। যে কোম্পানীর মালিক স্বয়ং রবার্ট বঢ়রা। ওই একই দিনে গজনীর গ্রামেই আরও ২৭ একর জমি কেনেন রবার্ট। তবে এবারও তাঁর বকলমে মহেশ নাগর ওই জমি কিনেছেন। ২০০৯-এর ১২ জুন আবারও গজনীতে ৩৯ একর জমি কেনেন রবার্ট। তবে এক্ষেত্রেও তিনি নেপথ্যে। প্রকাশ্যে তাঁর কোম্পানী ও মহেশ নাগর। জমি বিক্রেতাদের অনেকেই বলছেন তাঁরা জানতেন যে জমিটা তারা রবার্টকেই বিক্রয় করছেন। কিন্তু রেজিস্ট্রির সময় মহেশের উপস্থিতি দেখে তারা বিস্মিত হয়েছেন। তবে রবার্টের কোম্পানীর পক্ষে মহেশ এই জমি কেনায় রবার্টের আইনের ফাঁক দিয়ে গলার কোনও উপায় ছিল না। তাই রবার্টকে বাঁচাতে কৌশলে আইন সংশোধনের উদ্যোগ গেহলট সরকার নেয় বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

# কাটজু ভারতীয় মনীষীদের উপেক্ষা করেছেন : ভারতীয় বিচার কেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং বর্তমানে ইন্ডিয়ান প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মার্কন্ডেয় কাটজু সম্প্রতি তিরুবনন্তপুরমে সংসদবিষয়ক কাজকর্মে যুক্ত এক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতার সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে বলেন, আকবর ও নেহরুই ভারতকে

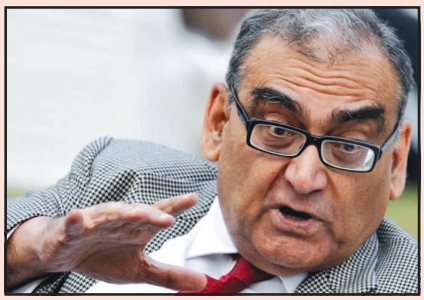

*কাটজু*

ঐক্যবদ্ধ করেছেন। ভারতীয়দের তিনি 'উদ্বাস্তু জাতি' (মাইগ্রেটেড নেশন) বলে বর্ণনা করেন।

তিরুবনন্তপুরমের 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' বলে পরিচিত ভারতীয় বিচার কেন্দ্রের ইতিহাসবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কাটজুর এই ইতিহাস ব্যাখ্যার উপর প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করেছেন। বিচার কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পি. পরমেশ্বরণ এক বিবৃতিতে বলেন, ভারতের সংহতি স্থাপনে আদি শঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকাকে কাটজু উপেক্ষা করেছেন। মাত্র কয়েক শ' বছর আগে আকবর জন্মেছেন, কিন্তু তার কয়েক শতাব্দী আগে শঙ্করাচার্য ভারত পরিভ্রমণ করে দেশের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্য স্থাপনের দ্বারা দেশকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন। গান্ধীজী তার 'হিন্দ স্বরাজ' পুস্তকে লিখেছেন— 'অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা তীর্থদর্শনের জন্য সারাদেশ পরিক্রমা করতেন। তার ফলে দেশ শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।" স্বামী বিবেকানন্দ যিনি ভারতবর্ষের 'ঘনীভূতরূপ' ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে গান্ধীজী ও নেহরু স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত কাটজু এই বিষয়গুলি অন্ধের মতো উপেক্ষা করেছেন। পি. পরমেশ্বরণ কাটজুর সমালোচনা করে বলেছেন— ইতিহাস বর্ণনায় চোখ বন্ধ করে তিনি ভারতকে 'উদ্বাস্তুদের জাতি' বলেছেন। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিককালের অনেক গবেষক সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব' ও 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিকে একটা শূন্য গর্ভ আত্মম্ভরিতা বলে বাতিল করে দিয়েছেন।

# মমতা কি চান—গণতন্ত্র না দলতন্ত্র ?

একটা বিষয় নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন প্রশাসনের সর্বত্র সিপিএমের ভূত দেখছেন। যাঁরাই মমতার স্তাবকতা যথেষ্টভাবে করছেন না, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদেরই সিপিএমের ভূত বলে চিহ্নিত করছেন। ইতিহাস বলছে, বিশ্বের সমস্ত ডিক্‌টেটর শাসকরাই এমন ভূত দেখতেন। স্তালিন, মাও, মুসোলিনি, হিটলাররা ভূতের আতঙ্কমুক্ত হতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন। মমতার চরিত্রেও একটা হামবড়া ডিক্‌টেটারসুলভ মানসিকতা পূর্ণমাত্রায় আছে। বিরোধী নেত্রী থাকাকালে সেটাই ছিল তাঁর প্লাস পয়েন্ট। সাধারণ মানুষ বাহবা দিতেন মমতা একাই সিপিএমের ঘাতক ক্যাডারদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন দেখে। তাঁর সাহসিকতা, বিদ্রোহিণী নারীরূপ বাংলার মানুষকে যথেষ্টই আকর্ষিত করেছিল। মানুষ ভোটে জিতিয়ে তাঁকে ক্ষমতার অলিন্দে পাঠিয়ে ছিলেন দলতন্ত্রমুক্ত এক স্বচ্ছ কল্যাণকারী প্রশাসন গড়তে।

কিন্তু তা হয়নি। সিপিএমের দলতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটানো দূরের কথা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতা হাতে পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি 'গুণ্ডারাজ' চালু করে দিয়েছেন। দলের মধ্যে যে ব্যক্তি যতবড় 'স্তাবক' তাঁকেই তিনি দলের 'মুখ' বলে সামনে এগিয়ে দেন। স্তাবকতার দৌড়ে সামান্য পিছিয়ে পড়লেই 'দিদি' তাঁকে লাস্ট বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন। এইভাবেই এখন সৌগত রায়, সাংবাদিক সাংসদ কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রা পিছনের সারিতে বসছেন। গার্ডেনরিচ কাণ্ডের পর ফিরহাদ হাকিমও এখন ব্যাকফুটে। তাই স্তাবকতার দৌড়ে ফিরে আসতে মরিয়া ফিরহাদ এখন তাই বলছেন, 'কে ইকবাল? ওই নামে কাউকে আমি চিনি না'। দৌড়ে অনেক পিছনে পড়ে থাকা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মশাইতো সুযোগ বুঝে এগিয়ে এসে জনসভায় ঘোষণাই করেছিলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে একাসনে বসবেন বাংলার নারী শক্তির প্রতীক মমতা দেবী। তৃণমূল দলে মমতা ভজনা এখন কোন পর্যায়ে গেছে ব্রাত্যবাবুর কথা থেকেই বোঝা যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'বছরের শাসনের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্রের পরিবর্তে দলতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

**গূঢ়পুরুষের**

**কলম**

পশ্চিমবঙ্গে কায়েম করতে আগ্রহী। সিপিএমও পশ্চিমবঙ্গে দলতান্ত্রিক শাসন চালিয়েছে দীর্ঘ ৩৫ বছর। কিন্তু দেশের সংবিধান, আইনকে একেবারে অগ্রাহ্য করে নয়। সিপিএম গণতন্ত্রের মুখোশ পরে দলতন্ত্র কায়েম করেছিল। মনস্বিনী মমতার ওইসব মুখোশের প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, প্রয়োজন হয় না বলেই তিনি অকাতরে বলতে পারেন উপনির্বাচনে হেরেছে বলেই অমন সোনার চাঁদ ছেলে হুমায়ুন কবীরকে মন্ত্রীত্ব ছাড়তে হবে? আমার 'গরমেন্ট'। আমি দলের সম্পদ হুমায়ুনকে মন্ত্রী রাখবো। বিধানসভাতেও হুমায়ুন বসবে। নির্বাচনে হেরে গেলে বিধায়ক পদ চলে যায় এসব মিডিয়ার অপপ্রচার। তৃণমূলের স্তাবক নেতাদের একজনেরও সাহস নেই বলার যে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত বিধায়কের সংখ্যা ২৯৪। সংবিধান এটাই বলছে। কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ইচ্ছামত বিধানসভার আসন সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারেন না। মমতা এসব যুক্তি মানতে নারাজ। তিনি বলে দিয়েছেন, সোনার চাঁদ হুমায়ুন কবীর বিধানসভায় মন্ত্রীর আসনে বসবে। সোজা কথায় সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় আসন বেড়ে যাচ্ছে।

মমতার দলের মুখপাত্র মুকুল রায় বলেছেন, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করবে রাজ্য সরকার। কবে এবং কীভাবে নির্বাচন হবে তা সরকারই ঠিক করবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এই ব্যাপারে কোনও এক্তিয়ার নেই। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত কমিশন মানতে বাধ্য। কমিশনের প্রধান মীরা পাণ্ডে তিন দফায় পঞ্চায়েত ভোট করাতে চাইছেন সিপিএমকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিতে। সিপিএম ২০১০ সালে মীরা পাণ্ডেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রধান পদে নিয়োগ করেছিল। তাই তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের স্বার্থই দেখছেন। মা-মাটি-মানুষের অনুগত 'পিপুলের' স্বার্থ দেখছেন না। আমরা চাই না কেন্দ্রের আধা সামরিক বাহিনী ভোটের সময় মোতায়েন করতে। ওরা আমাদের 'পিপুলের' সঙ্গে পরিচিত নয়। চিনতে না পেরে আমাদের 'পিপুল'-কেই ধোলাই দিতে পারে। তাই আমাদের নেত্রী চাইছেন ভোটের দিন রাজ্য পুলিশ থাকুক। এই সহজ কথাটা মীরা পাণ্ডে মহাশয়া বুঝতে চাইছেন না। কারণ, তিনি সিপিএমের এজেন্ট। সিপিএমের হয়ে কাজ করছেন।

ঠিক এইভাবেই দলনেত্রী ও তাঁর স্তাবকদল মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায়কে সিপিএম এজেন্ট বলেছেন। অথচ অশোকবাবুর নিয়োগপত্র দেয় স্বয়ং মমতার 'গরমেন্ট'। মমতা নিজেও সেকথা মানেন। একাধিকবার বলেছেন, 'আমি ওনাকে কমিশনে বসিয়েছি। এখন আমার বিরুদ্ধে কাজ করছেন। তাই ওইসব মানবাধিকার টিকার আমি মানছি না। একই কথা প্রাক্তন সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বলতেন। জনসাধারণ তাঁকে রাজনীতির আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। জনসভায়, টিভিতে তাঁর মুখ দর্শন করলে সিপিএমের ভোট কমছে আজও। মমতা এবং তাঁর স্তাবকবৃন্দের অন্তিম পরিণামও যে তাই হতে চলেছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

# লাগে টাকা, দেবে রং-তুলি

**মাননীয় শ্রী পি চিদম্বরম**
**অর্থমন্ত্রী, ভারত সরকার**
**নয়াদিল্লি**

সদ্য সদ্য সাধারণ বাজেটে আপনি লেডিজ ব্যাঙ্ক তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন। ভালো। মানে শুনতে ভালো। মেয়েরা খুশি হবে। কিন্তু কেন খুশি হবে জানি না। সাধারণ ব্যাঙ্কে তাদের খুব যে অসুবিধা হচ্ছে সেটা তো শুনিনি। ও আচ্ছা। বুঝেছি। ওটা হাততালি কুড়োনোর কায়দা। দেশের অর্থনীতির যা হাল তাতে সাধারণ মানুষকে তো আর খুশি করা সম্ভব নয়। তাই একটু আধটু চমক দেওয়াকেই পথ হিসেবে নিয়েছেন। সামনের বছর লোকসভা ভোট। তখন তো আর বাজেট থাকবে না। ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করা হবে। তাই আগেভাগেই একটা চমক দিয়ে রাখলেন। মেয়েরা কিন্তু এদেশে এখনও আদৌ ভোট ব্যাঙ্ক নয়। তাহলেও কেন করলেন? ও বুঝেছি। মেয়েদের জন্য আলাদা করে কিছু করলে মানে করার কথা বললেই হাততালি পাওয়া যায়।

তবে এ ব্যাপারে কিন্তু আপনাকে হার মানতে হবে আমাদের দিদির কাছে। কে যেন একজন বলেছিলেন না, বাংলা আজ যা ভাবে গোটা দেশ সেটা অনেক পরে ভাবে। সেই শ্লোককে সত্যি করে অনেক আগেই বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রেলে চালু হয়েছে লেডিজ লোকাল। যদিও ফাঁকা লেডিজ লোকাল যখন ভিড় স্টেশনে আসে এবং যায় তখন একদিন হাততালি দেওয়া পুরুষেরা এবং পুরুষদের সঙ্গে বের হওয়া লেডিজরা প্রাণ ভরে গালাগাল দেন।

সে যাক। ভালো কাজের সমালোচনা চিরকাল হয়েছে। এখনও হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। তবে রেলমন্ত্রীর সময় যেমন ছিলেন বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও তেমন লেডিজদের প্রতি সদয়। পার্ক স্ট্রিটে ধর্ষণকে তিনি সাজানো ঘটনা বলতে পারেন কিন্তু তিনিই এই রাজ্যে লেডিজ আদালত কিংবা লেডিজ পুলিশ স্টেশন বানানোর প্ল্যান প্রোগ্রাম করেছেন। এবার বাংলার মেয়েদের জন্য চালু হলো কন্যাশ্রী প্রকল্প। প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক কী আছে এই প্রকল্পে।

বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার এমন পরিবারকে কন্যাসন্তানের লেখাপড়ার জন্য দেওয়া হবে স্কলারশিপ। অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য বার্ষিক ৫০০ টাকা করে স্কলারশিপ দেবে রাজ্য সরকার। ৫০ হাজার টাকা রোজগারের পরিবারের কন্যাসন্তানের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ১৮ বছর বয়স হলে যে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে তার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষারও সুযোগ পাবেন দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা। তাঁর দলের এবং সরকারের প্রচার কন্যাসন্তান সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ একই সঙ্গে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করবে। একটি বিলের মাধ্যমেই যেমন কন্যা ভ্রূণ হত্যার অভিশাপ মোছা যাবে তেমনই বন্ধ করা যাবে স্কুল-ছুটের সমস্যা। পরিসংখ্যান বলে, এই রাজ্যেই শুধু নয়, গোটা দেশেই ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুল-ছুটের প্রবণতা অনেক বেশি। অপরদিকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার খরচ হাতে আসায় রাজ্যে নারী শিক্ষার হারও বাড়বে। মেয়েকে পড়াশোনা করানো পরিবারের কাছে বোঝা না হয়ে ওঠায় পরিবারের দিকে থেকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া কিংবা কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতাও কমবে। আর ১৮ বছর পূর্ণ করার পর ২৫ হাজার টাকা দেওয়ার সরকারি প্রস্তাবও নাবালিকা বিবাহ রোধে দাওয়াইয়ের কাজ করবে।

চিদাম্বরম সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এটা অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব। অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলবেন, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'টাকা নাই, টাকা নাই' বলে কান্নাকাটি করেন তিনি এত দান খয়রাত করার জন্য টাকা কোথায় পাবেন? টাকা কোথা থেকে আসবে?

আজব প্রশ্ন আপনাদের। টাকা নেই বলে কি ভালো ভালো কথা বলতে নেই? হাততালি কুড়োতে নেই? সামনে পঞ্চায়েত ভোটের মুখে একটু চমক দিতে নেই? টাকাই কি সব? জানেন না, টাকা মাটি, মাটি টাকা। রামকৃষ্ণের বইটইও পড়েননি নাকি?

মা-মাটির নেত্রী তো ওই থিয়োরিতেই মানুষের মধ্যে টাকা বিলোবার এত প্রতিশ্রুতি দেন। স্বপ্নের পোলাওয়ে ঘি ঢালতে কোনও কার্পণ্য করেন না। আবার সবটাই তো স্বপ্ন নয়। অনেক ক্লাবকেই উনি টাকা দিয়েছেন। সেই টাকায় ক্লাবে ক্লাবে ক্যারাম বোর্ড কেনা হয়েছে। যদিও সেই ক্যারামে রেড ঘুটিটা নেই। লালের বদলে সবুজ ঘুটি তৈরি হয়েছে।

যাই হোক শুনুন চিদাম্বরমবাবু, টাকা আপনারা দেবেন না বলে ভাববেন না এই রাজ্যে প্রতিশ্রুতি বন্ধ থাকবে। ধোঁয়া ওঠা শিল্প না হোক রাজ্যে কথাশিল্প বজায় থাকবে। আপনাকে চুপি চুপি একটা খবর দিয়ে রাখি। আমাদের দিদিভাই এখন দিনরাত এক করে ছবি আঁকছেন। ছবির পর ছবি। এরপর ইন্টারন্যাশনাল অকশানের ব্যবস্থাও করা হবে। আরে বাবা ওই টাকাতেই তো দলের ভোট প্রচার থেকে সরকারি কর্মীদের মাইনে কিংবা কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা সব হবে। হবেই।

— **সুন্দর মৌলিক**

# বাজেট, না বার্ষিক অভিশাপ

অম্লানকুসুম ঘোষ

বাজেট কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসেব। কিন্তু কথাটির আলংকারিক বা প্রয়োগমূলক অর্থ এই আক্ষরিক অর্থের গণ্ডী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অর্থনীতির এক বিস্তীর্ণ সীমানায়।

যে কোনও রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিকাশের প্রধান মাধ্যম হলো অর্থনীতি। মানব শরীরে যেমন ফুসফুস, রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে অর্থনীতি তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের অন্যান্য দিকগুলি তাদের বিকাশের রসদ খুঁজে পায়। আর বাজেট যেহেতু অর্থনীতির সর্বপ্রধান নীতি নির্ধারক, তাই বাজেট কি দিশা দেখাচ্ছে তা অর্থনীতির বিশ্লেষক থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণ সকলের কাছেই হয় আগ্রহের উৎস।

প্রত্যেকবারের মতোই এবারও আমাদের দেশে ২৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে এক সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির অবস্থাও টালমাটাল। বর্তমান উদার অর্থনীতির যুগে প্রত্যেক দেশের অর্থনীতিই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। তাই বিশ্ব অর্থনীতির এই বিপর্যয়ের আঁচ এসে পড়েছে ভারতের ওপরেও। এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে বাঁচবার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা আদৌ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা তা একটু দেখা যাক।

গত কয়েক বছর সরকারের আর্থিক নীতি মূলতঃ বিলগ্নীকরণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল। এ বছরের বাজেটে সেই বিলগ্নীকরণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ফিসকাল ডেফিসিট বা রাজস্ব ঘাটতি কম করার লক্ষ্যে এবার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ করে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা তোলার কথা বলা হয়েছে এবারের বাজেটে। সিদ্ধান্তটি কথামালার সেই সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের পেট কাটার গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিলগ্নীকরণের লক্ষ্যে রাখা হয়েছে তার প্রায় সবকটিই লাভজনক, তার মধ্যে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রগুলি তো লাভের অন্যতম বড় উৎস। এককালীন অর্থাগমের আশায় সেই লাভের উৎসমুখগুলি বেসরকারি হাতে তুলে দিলে ভবিষ্যতের দীর্ঘকালীন আয় যে বন্ধ হয়ে যাবে সে কথা অদ্ভুত ভাবে এই বাজেটে খেয়াল রাখা হয়নি। বিলগ্নীকরণের ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ত্রিবিধভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একটু আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র সহ অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সে সমস্ত ক্ষেত্র থেকে দেশের জনসাধারণ ক্রেতা হিসেবে হয় পরিষেবা নয় পণ্য ক্রয় করে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা যে নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে এই পণ্য ও পরিষেবা পেত তা ব্যক্তিগত লাভ সৃষ্টিকারী বেসরকারি সংস্থার থেকে পাবে না। ফলে দেশের বিপুল সংখ্যক ক্রেতা-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে তাদের ক্রেতা-বাজার হারাবে। ফলে দেখা দেবে অর্থনৈতিক অসাম্য যা দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করবে, আবার এর ফলে সামাজিক ন্যায়-এর ওপরও প্রভাব পড়বে যা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে করে তুলবে অসহনীয়। উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র সামগ্রিকভাবে পঞ্চান্ন কোটির কিছু বেশি মানুষকে পরিষেবা দেয়। এই উপভোক্তাদের বড় অংশই হলো মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংগঠিত পরিষেবা এই বিরাট সংখ্যক উপভোক্তাকে ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের সর্বাধিক সুফল প্রদান করে। Financial inclusion-এর মাধ্যমে এই উপভোক্তা সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে ভবিষ্যতে। ফলে আগামীদিনে সমগ্র দেশ ব্যাঙ্কিং-এর আওতায় আছে এরকম এক সোনালী সমাজের কথা চিন্তা করা যাচ্ছিল। কিন্তু বিলগ্নীকরণ এই সুখস্বপ্নের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের বিলগ্নীকরণের ফলে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাঙ্ক ছোট উপভোক্তাদের দূরে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র বড় কর্পোরেট হাউসকে নিয়ে কাজ করবে। এতে তাদের কাজের পরিমাণ কমবে ও লাভের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবে ও তাদের সঞ্চয় কখনওই বিনিয়োগে পরিণত হবে না। যা দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করবে। আবার এই ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলি তখন মহাজনদের হাতে গিয়ে পড়বে যার ফলে দেখা দেবে সামাজিক অসাম্য। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি

**এ বছরের বাজেটে উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রায় সবকটি ক্ষেত্রকেই খুলে দেওয়া হয়েছে প্রত্যক্ষ বা আংশিক পরোক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সামনে। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির কিছু সাময়িক পট পরিবর্তনের ফলে ডলারের তুলনায় টাকার দাম নিম্নমুখী। ফলে সহজেই বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ভারতের বাজারে ঢুকে তাদের কব্জায় নিয়ে নিতে পারবে ভারতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক ক্ষেত্রগুলির একটা বড় অংশকে।**

দেশের এক বড় অংশের কর্মদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবসমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক এই সব রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কাজ করে দিনযাপন করে। যা তাদের চিরস্থায়ী ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করে দেশের অর্থনীতিকে চাহিদা জোগানের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, আবার তাদের সম্মানজনক জীবনের সন্ধান দিয়ে এক আদর্শ শান্তিপ্রিয় তৃপ্ত সমাজগঠনে সাহায্য করত। কিন্তু বিলগ্নীকরণের ফলে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা বেশি লাভের লোভে কর্মীসংখ্যা কমাবে এবং তাদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুবিধাও কমাবে। ফলে কর্মহীনের সংখ্যা আরও বাড়াবে যা বর্তমান বেকারির যুগে অর্থনীতিতে আরও চাপ সৃষ্টি করবে। আবার যে কতিপয় লোকের হাতে কাজ থাকবে পারিশ্রমিক হ্রাসের ফলে তাদেরও ক্রয়ক্ষমতা কমবে যা দেশের মোট চাহিদাকে কমিয়ে দেবে। ফলে দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে। আবার অধিক পরিশ্রম ও কম বেতনের জীবনে বাধ্য হওয়া এই বিপুল সংখ্যক লোকের জীবনে নেমে আসবে হতাশা যা সমাজ-মানসিকতার সুস্থ বিকাশে বাধা দেবে। তৃতীয়ত, যে ফিসকাল ডেফিসিট কমাবার লক্ষ্যে এই বিলগ্নীকরণ করা হয়েছে সেই ফিসকাল ডেফিসিট এর ফলে আরও বেড়ে যাবে। কারণ বিলগ্নীকরণের ফলে এককালীন আয়ে একবছরের ফিসকাল ডেফিসিট কিছুটা কমলেও পরবর্তী বছরগুলি থেকে ওই সংস্থাগুলির কাছ থেকে পাওয়া লভ্যাংশ সরকারের হস্তচ্যুত হবে যা সরকারের ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী আয় কমাবে। ফলে প্রতি বছর সরকারের ফিসকাল ডেফিসিট বাড়তেই থাকবে। কাজেই বলা যায় বিলগ্নীকরণের ফলে সাময়িক কিছু সুবিধা সরকারের হলেও সামগ্রিকভাবে এতে সরকার ও দেশ উভয়েরই চরম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে।

তাহলে Fiscal Deficit কমাবার রাস্তা কি? প্রথমত, সরকারের উচিত আয় বাড়ানোর নতুন পন্থা আবিষ্কার করা, যেমন কালো টাকা উদ্ধার, অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিদের আরও বেশি করের আওতায় আনা, অতি-বৃহৎ জোতের কৃষকদের আয়করের আওতায় আনা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, সরকারের যোজনা বহির্ভূত খাতে ব্যয় কমিয়ে মোট সরকারি ব্যয় কমানো উচিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাজেটে এর কোনওটিই করা হয়নি।

বাজেটের আর একটি বড়দিক হলো বিদেশী বিনিয়োগের কাছে বাজারকে মুক্ত করে দেওয়া। গত এক বছর ধরেই সরকার এ ব্যাপারে প্রস্তুতি চালাচ্ছে আর এ বছরের বাজেটে উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রায় সবকটি ক্ষেত্রকেই খুলে দেওয়া হয়েছে প্রত্যক্ষ বা আংশিক পরোক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সামনে। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির কিছু সাময়িক পট পরিবর্তনের ফলে ডলারের তুলনায় টাকার দাম নিম্নমুখী। ফলে সহজেই বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ভারতের বাজারে ঢুকে তাদের কব্জায় নিয়ে নিতে পারবে ভারতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক ক্ষেত্রগুলির একটা বড় অংশকে। সাময়িকভাবে শেয়ার বাজারে এর ফলে হয়তো উত্থান দেখা যাবে কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখা যাবে বিপুল বিপর্যয়। কারণ এই বিনিয়োগ সরাসরি উৎপাদন ক্ষেত্রে গিয়ে অধিক শ্রমের সৃষ্টি করবে না বরং পারস্পরিক বোঝাপড়ার অলিগলির গোপন মন্ত্রে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সৃষ্টি করবে এক বিরাট পার্থক্য যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি হবে অতি চড়া ও তার ফলে সংস্থাগুলির লাভ ও আপামর জনসাধারণের ক্ষতির পরিমাণ দুই-ই হবে ঊর্ধ্বাভিমুখী। অন্যদিকে বিদেশ-নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি নিজেদের মধ্যে সব চুক্তি করবে বিদেশে, ফলে সরকার হাজার হাজার কোটি টাকার প্রাপ্য কর হারাবে যা সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কমিয়ে দেবে। ফলে যোজনা খাতে ব্যয় কমবে, ফলে দেশের সামগ্রিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

এবারের বাজেটে আরও কয়েকটি বিষয় আছে যা সাময়িক চমক সৃষ্টি করলেও যুক্তির কষ্টিপাথরের বিচারে কালোত্তীর্ণ নয়। এগুলি দেশের কোনও উপকারে আসবে না বরং সরকারি অর্থের অপচয় বাড়াবে। যেমন এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য ব্যাঙ্ক খোলা হবে। বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে কাজ ও পরিষেবা উভয় ক্ষেত্রেই ছেলে ও মেয়ের কোনও ভেদ নেই, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যাঙ্ক খুলে সেই ভেদকে আরও প্রকট করা হচ্ছে ও অপ্রয়োজনীয় কাজে সরকারের এক হাজার কোটি টাকা অপব্যয় করা হচ্ছে। যে অর্থে অনেক জনহিতকর কাজ করা যেত।

চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই বাজেট নতুন কোনও আশার কথা শোনাতে পারেনি। আয়করের ক্ষেত্রে ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা একই রয়েছে, শুধু দু' হাজার টাকার একটি সরাসরি কর ছাড়ের সান্ত্বনা প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। যদিও মুদ্রাস্ফীতির কথা মাথায় রেখে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হয় তাহলে আয়করে আরও কুড়ি শতাংশ অর্থাৎ চল্লিশ হাজার টাকার ঊর্ধ্বসীমা ছাড় দেওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল বলে সব অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত।

অপরদিকে, অতি ধনীদের ক্ষেত্রে আয়করের পরিমাণ তিরিশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে চল্লিশ বা পঞ্চাশ শতাংশ করার দাবিও জানিয়েছিল অর্থনীতির গবেষকদের একটা বড় অংশ। কিন্তু সেই দাবিও নস্যাৎ করে সামান্য কিছু সারচার্জের খুড়োর কল ঝুলিয়ে দায় এড়িয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেট। এর ফলে একদিকে যেমন রাজ্যগুলি তাদের একট বড় প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলো, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারও এক বিপুল আয়ের সম্ভাবনা হারাল, অথচ প্রত্যক্ষ কর বাবদ এই মোটা টাকা যদি আয় হোত তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত সরকার বেকার-ভাতা চালু করার মতো নানা জনহিতকর প্রকল্প হাতে নিতে পারত।

খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি নানান সামাজিক প্রকল্পের কথা এই বাজেটে বলা হলেও এর জন্য অর্থের সংস্থান বা প্রকল্পগুলির রূপায়ণের সঠিক দিক নির্দেশ এই বাজেটে করা হয়নি। ফলে এগুলিকে সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বদলে ভোটমুখী রাজনৈতিক আখের গুছোনোর পদক্ষেপ বলে মনে করাই স্বাভাবিক।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার, সংগঠিত বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, বেকার যুবক-যুবতী বা উপভোক্তা কারওই কোনও লাভ হয়নি, শুধু লাভ হয়েছে কিছু বিদেশী ও তার সহকারী দেশী বণিকের। তবে কি আবার বণিকের মানদণ্ড দেখা দেবে রাজদণ্ডরূপে?

## সাম্প্রদায়িক হামলা চলছে বাংলাদেশে

# কি বার্তা নিয়ে গেলেন প্রণববাবু?

**ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥** বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, জায়গা-জমি দখল, বাড়িঘর দোকানপাটে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এবং মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে দেওয়া নতুন কিছু নয়। অব্যাহতভাবে এই হামলা চলে আসলেও মাঝে মধ্যে কোনো অজুহাতে ব্যাপক আকার ধারণ করে। মূল লক্ষ্য হিন্দুদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকে ফিরে এসে ভিটাবাড়িও ফেরত পায়নি। তবু নতুন দেশ হবে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতামুক্ত, এ আশায় বুক বেঁধে নতুন ভাবে জীবন গড়ে তোলে। সে আশা স্থায়ী হয়নি, দুই সমরনায়ক জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এসে দেশকে ফের পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে যায়, হিন্দু নির্মূল অভিযান চলে। নব্বইয়ে এরশাদের আমলে এবং ১৯৯২ ও ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলার সঙ্গে একমাত্র মধ্যযুগীয় বর্বরতার তুলনা চলে। এই তিন হামলার পর হিন্দুদের হার বাংলাদেশে প্রায় নয় শতাংশে নেমে আসে। প্রায় চার হাজার মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, হাজার হাজার বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলা ও লুটপাট চালানো হয়। ধর্ষণের শিকার হন কয়েক হাজার নারী।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াতে ইসলামির নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদির মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হওয়ার পর আবার ব্যাপক হামলা শুরু হয়েছে, এই খবর লেখা পর্যন্ত এই হামলা প্রায় ৩০টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দুই সংগঠন 'বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ' এক যুক্ত সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, সাঈদির দণ্ড ঘোষণার পর সারাদেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালানো হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে গত ছয় দিনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় পৌনে দু'হাজার বাড়িঘর ও দোকানপাট এবং একশোর মতো মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে চট্টগ্রামে একটি মন্দিরের পুরোহিতসহ চারজনকে। এবারের সাম্প্রদায়িক হামলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, হামলা হয়েছে ভারতের বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সফরের সময়। প্রণববাবুর তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরের তিনদিনই টানা হরতাল চালানো হয়েছে, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নিন্দা জানালেও ভারতের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। প্রণববাবু সফর শেষ করে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার কিছু আগে দিল্লী উড়ে যাওয়ার পর হরতালও শেষ হয়েছে। প্রণববাবু কি বার্তা নিয়ে গেলেন? ধর্মান্ধ শক্তির বার্তা কি তিনি পেয়েছেন?

*শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রণব মুখার্জীর একান্ত আলোচনা।*

সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, সম্প্রতি জামায়াতের হামলার সময় দেখা গেছে আওয়ামি লিগ সাংসদরাও নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াননি। যাদের ভোট না হলে সংসদে আসা হোত না তাদের প্রতি কোনও কর্তব্য আছে বলে তারা মনে করেননি। বিএনপি যেখানে জামায়াতকে উস্কে দিচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতা ও

ধর্মান্ধতাকে সহায়তা করছে, সেখানে বিএনপি সাংসদরা পাশে থাকবেন না— এট সংখ্যালঘুরা জানেন। কিন্তু জানেন না আওয়ামি লিগ কেন পাশে থাকবে না। কেন থাকবে না ১৪ দলের নেতাকর্মীরা। 'বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ' অভিযোগ করেছে, কয়েকদিন ধরে সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক ঘটনা চলাকালে অসহায় জনগণের পাশে আওয়ামি লিগ সাংসদ কিংবা নেতৃবৃন্দকে দেখা যায়নি। ব্যর্থ হয়েছে প্রশাসনও। সময়মতো পদক্ষেপ প্রশাসন নেয়নি।

কিছু ঘটনা নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। আওয়ামি লিগ জামায়াতকে রুখতে বদ্ধপরিকর— এমন একটি কথা আওয়ামি লিগ নেতারা যে কোনও সমাবেশে বলতে দ্বিধা করেন না। শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ব্লগার রাজীব হালদার জামায়াত কর্মীদের হাতে প্রাণ হারানোর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজীবের বাসায় গিয়ে বলে এসেছিলেন, জামায়াতের রাজনীতি করার অধিকার নেই। পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনাই বলেছেন, জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার কোনও চিন্তা সরকারের নেই। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ কুষ্টিয়ায় এক জামায়াত নেতাকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সদর উপজেলা আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক পুলিশকে বাধা দেন। এর আগে রাজবাড়িতে জামায়াত নেতাকে গ্রেপ্তারে বাধা দেন আওয়ামি লিগ নেতারা। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রথম মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন জামায়াত নেতা আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকারের। কিন্তু তার আগেই তিনি পালিয়ে যান পাকিস্তানে। অভিযোগ আছে, আওয়ামি লিগের সভাপতিমণ্ডলির সবচেয়ে প্রভাবশালী এক সদস্যই ৫ কোটি টাকার বিনিময়ে বাচ্চু রাজাকারকে পালাতে সহায়তা করেন। সিলেটে মাসখানেক আগে কয়েকজন সশস্ত্র জামায়াত-শিবির কর্মী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু মামলা হওয়ার আগেই আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় এক সাংগঠনিক সম্পাদকের নির্দেশে তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। এই জামায়াত-শিবির কর্মীরাই গত শনিবার বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতা জগৎ জ্যোতি তালুকদারকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে। এরকম উদাহরণ অসংখ্য। গত বছরের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম এবং পরবর্তী সময়ে সাতক্ষীরা ও দিনাজপুরে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক হামলায় কয়েক ডজন মন্দির পুড়েছে, হামলায় নিঃস্ব হয়ে গেছে অন্তত একশো পরিবার। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, বিরোধী দলীয় নেত্রী, সাংসদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পুলিশের আইজিসহ প্রশাসনের তাবড় তাবড় নেতারা দেখতেও যাননি। কিন্তু কয়েক মাস আগে কক্সবাজারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মন্দির ও বসতবাড়িতে ব্যাপক হামলার পর পড়িমড়ি করে সবাই ছুটলেন ঘটনার অব্যবহিত পরই। সামরিক বাহিনী নামলো মন্দির নির্মাণে। এটাও অত্যন্ত অর্থবহ।


## 'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

### কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

### জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

**ডাঃ এস কর,** মোবাইল নং-9434877734

*—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—*

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

## যুদ্ধপরাধীদের শাস্তি নিয়ে বাংলাদেশে তাণ্ডব

# এবারেও টার্গেট হিন্দুরা

**ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥** আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একাত্তরে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদির মৃত্যুদণ্ডের (দেলু রাজাকার) রায় ঘোষিত হওয়ার পর জামায়াত-এ- ইসলামি ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির দেশজুড়ে তাণ্ডব শুরু করে। তারা হিন্দুদের ওপরও '৭১, '৯০, '৯২ ও ২০০১ সালের মতো হামলা শুরু করে। এ হামলায় তাদের সহযোগিতা করে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। নিচে ৪ মার্চ পর্যন্ত হিন্দুদের ওপর হামলার কয়েকটি খণ্ড চিত্র তুলে ধরা হলো :

*কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়েছে।*

**চট্টগ্রাম :**

বাঁশখালী উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ১২টি বাড়ি ও তিনটি মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর। একটি মন্দিরের পুরোহিত হামলায় নিহত। প্রায় ৫০টি দোকানে লুটপাট ও ভাঙচুর। সাতকানিয়া উপজেলায় ৮টি বাড়ি ও একটি বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর। ৫০টিরও বেশি দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাট। চট্টগ্রাম শহরে চট্টেশ্বরী সড়কে কয়েকটি হিন্দু দোকানে হামলা।

**কক্সবাজার :**

কুতুবদিয়া ও মহেষখালিতে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ।

**নোয়াখালী :**

বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জে তিনটি হিন্দু বাড়ির ৪৫টি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। ৯টি বাড়িতে হামলা ও লুটপাট হয়েছে। রাজগঞ্জ বাজার কালীমন্দির, পশ্চিম কালীতলা মন্দির, মনসা মন্দির, হরিসেবা আশ্রমসহ চারটি মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর। সেনবাগ উপজেলায় উত্তর মোহাম্মদপুর গ্রামে ৩ মার্চ রাতে বণিক বাড়ির খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হয়।

**লক্ষ্মীপুর :**

সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ বাজারে হিন্দুদের ৫টি সোনার দোকান ও ১টি মুদির দোকানে হামলা ও লুটপাট। দালালবাজারে হরিবাস উৎসবে হামলা। রায়পুর গাইয়ার চরে একটি মন্দির, বিবেকানন্দ সেবাশ্রম ও চাঁদঠাকুর আশ্রমে অগ্নিসংযোগ। রামগতি পৌরসভার চরসীতা এলাকায় ১ মার্চ রাতে নীতিশ চন্দ্র দাসের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। নীতিশবাবু ও পরিবারের সদস্যরা ওই সময় বাড়িতে ছিলেন না।

**গাইবান্ধা :**

সুন্দরগঞ্জে বেলকা গ্রামে ৩৫টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও বামনডাঙ্গা গ্রামে ৬টি বাড়ি ও দোকানে হামলা ও ভাঙচুর।

**সিলেট :**

কানাইঘাট উপজেলার গাছবাড়ি বাজারে হিন্দুদের দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট।

**মৌলভীবাজার :**

বড়লেখার জুড়িবাজারে পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ঔষধের দেকান ভাঙচুর।

**ঠাকুরগাঁও :**

সদর উপজেলার গড়েয়া গ্রামে ১০টি হিন্দু বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর।

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ :**

সদরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের দোকানপাটে হামলা ও ভাঙচুর। কানসাটে মন্দিরে হামলা। শিবগঞ্জ পৌষ এলাকায় আলিভাঙ্গা গ্রামে দুর্গা মন্দিরে অগ্নিসংযোগ। দুর্গা মূর্তি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।

**সাতক্ষীরা :**

শ্যামনগরে সাধুচরণ মণ্ডলের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর । সদর থানায় আবাদের হাটে দুটি হিন্দু বাড়িতে হামলা ও লুটপাট।

**বাগেরহাট :**

মোরেলগঞ্জ থানার সিংজোড়

গোপালপুর সার্বজনীন পূজা মণ্ডপ ভাঙচুর।

**জয়পুরহাট :**

পাঁচবিবিতে তিনটি হিন্দু বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট।

*জয়পুরহাটে হিন্দু দেবদেবীর উপর আক্রমণ।*

**কুমিল্লা :**

সদরে ব্রাহ্মপাড়ায় একটি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া :**

কসবা উপজেলার খেউড়া বাজারে ১ মার্চ রাতে ১১টি দোকানে অগ্নিসংযোগ। এর মধ্যে ৪টি দোকান হিন্দুদের, ছয়টি আওয়ামি লিগ সমর্থক মুসলমানের।

**সিরাজগঞ্জ :**

২ মার্চ রাতে এনায়েতপুর থানার রূপসী গ্রামে একটি মন্দির ও গোপালপুরে একটি কালীমন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর।

**বরিশাল :**

গৌরনদী উপজেলার নলচিড়া ইউনিয়নের পিংলাকাঠি (বোরাদী গরঙ্গল) গ্রামে সার্বজনীন দুর্গামন্দিরে ১ মার্চ রাতে হামলা। প্রতিমা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ।

**নেত্রকোনা :**

১ মাচ রাতে নেত্রকোনায় পূর্বধলা উপজেলার একটি কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ।

**গাজিপুর :**

সদর উপজেলার কাশিমপুর নামাবাজারে কালী মন্দিরের পাশের মণ্ডপে ১ মার্চ রাতে সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর।

**সিলেট :**

২ মার্চ সদরে মদিনা মার্কেটের কাছে পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের জেলা কমিটির সক্রিয় সদস্য জগৎজ্যোতি তালুকদারকে কুপিয়ে হত্যা।

**খুলনা :**

ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া ইউনিয়নে একটি মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

**যশোর :**

অভয়নগর উপজেলার ভুলাপাতা গ্রামে কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে জামায়াত-শিবির কর্মীদের হামলা ও লুটপাট।

**গোপালগঞ্জ :**

কোটালিপাড়ায় লাকির পাড়ে দুর্গামন্দিরে অগ্নিসংযোগ।

**নাটোর :**

বড়াইগ্রাম উপজেলার তিরাইল হিন্দুপাড়ায় ৩ মার্চ রাতে শিবেন সরকার ও শিক্ষক নিমাই কুমার সরকারের খড়ের ঘর ও চারটি খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হয়। রাত সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশ ও দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভায়।

**ফেনী :**

সোনাগাজি উপজেলার চান্দলা গ্রামে শান্তিরঞ্জন কর্মকারের বাড়িতে ৩ মার্চ রাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একই রাতে চরসাহাভিখারী গ্রামে ভবানী মাঝির বাড়িতে তিনটি খড়ের গাদায় এবং ৪ মার্চ দুপুরে লক্ষ্মীপুর গ্রামে বলরাম শীলের বাড়িতে খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হয়।

**মুন্সিগঞ্জ :**

লৌহজং উপজেলার গোয়ালিমান্দ্রা এলাকায় ৩ মার্চ রাতে মনিপাড়া সার্বজনীন কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হলে কালীমূর্তি পুড়ে যায়।

**পাবনা :**

৩ মার্চ রাতে বেড়া পৌর এলাকার দাসপাড়ায় বুড়িতলা মন্দিরে এবং কামারপাড়া মহলার নারায়ন চন্দ্র নন্দীর পারিবারিক মন্দিরে হামলা করা হয়।

**কুড়িগ্রাম :**

ফুলবাড়ি উপজেলায় একটি শিবমন্দিরে হামলা করা হয় ৪ মার্চ ভোরে।


SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

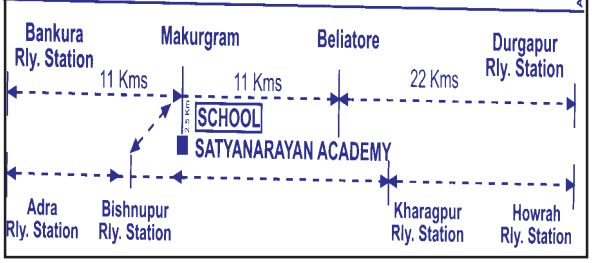

# বাংলাদেশ কি গৃহযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে?

**ধীরেন দেবনাথ**

দীর্ঘ প্রায় চার দশক পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমিক জনগণ 'বাঙালি' জাতিসত্ত্বায় এসেছেন ফিরে এবং অনেকটাই কাকতালীয়ভাবে। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশকে অন্তত তিন দশকই শাসন করেছে সামরিক শাসক ও জামাতে ইসলামি (স্বাধীনতার শত্রু) বিএনপি জোট। যেসব সামরিক শাসক ক্ষমতা দখল করেছে তারাও ছিল ইসলামপন্থী। ফলে বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত চার মূল রাষ্ট্রীয় (সাংবিধানিক) নীতি— গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ (বাঙালি) শুধু যে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা-ই নয়, জেনারেল এরশাদ সংবিধানের শুরুতে 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' ঢুকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম'কে সংবিধানভুক্ত করে দিয়েছেন। আর এরশাদের সেই পদক্ষেপে বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকেই করা হয়েছে অস্বীকার। অর্থাৎ বাংলাদেশের বুক থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটিকেই করা হয়েছে ঝেঁটিয়ে বিদায়। এমনকী, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তন ঘটিয়ে করা হয়েছে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশ বেতার (স্বাধীন বাংলাদেশে গৃহীত নাম) নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে রেডিও পাকিস্তান-এর অনুকরণে রেডিও বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, জাতীয়তা 'বাঙালি'-র পরিবর্তে 'বাংলাদেশি' করা হয়েছে। যুক্তি একটাই— পশ্চিমবঙ্গবাসী বিশেষত হিন্দুরাই বাঙালি, মুসলিমরা নয়। তাই বাংলাদেশের জনগণের জাতীয়তা 'বাংলাদেশি'। এমনকী, মধ্যপন্থী আওয়ামি লিগসহ ১৪ দলের জোট ২ বার ক্ষমতায় এসেও সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম' ও ''বিসমিল্লাহির...'' বাতিল করতে সাহস দেখায়নি রাজনৈতিক স্বার্থে। যেহেতু বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মুসলিম ধর্মভীরু। তাই তাঁদের ধর্মীয় ভাববেগে আঘাত লাগবে এবং ভোট হারাতে হবে— এই ভয়ে ওই সব কথা সংবিধান থেকে বাতিল করেনি তাদের সরকার। ভোট বড় বালাই!

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলন দেখেননি। নতুন প্রজন্ম শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পড়ে, সিনেমা দেখে, গল্প শুনে এবং পূর্বপুরুষ বা পরিবারের বয়স্কদের কাছ থেকে

জেনেছেন— স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ কী ছিল, সেই যুদ্ধে কে কী ভূমিকা পালন করেছিল এবং কারা ছিল স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষে। আর এভাবেই তাঁরা জেনেছেন, কেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হলো, সংবিধানের মূল নীতিগুলিকে উল্লঙ্ঘন করে সামরিক শাসকরা এবং স্বাধীনতার শত্রু জামাত ও তার জোট সঙ্গী (বিএনপি, মুসলিম লিগ ইত্যাদি)-রা বাংলাদেশ শাসনের সুযোগ পেল। তাঁরা আরও জেনেছেন, বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে যুদ্ধাপরাধী তথা স্বাধীনতার শত্রু রাজাকার-জামাত পাণ্ডারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে বা নিজেদের সংশোধিত না করে উল্টে স্বাধীনতা সংগ্রামী বা দেশপ্রেমিকদের খুন, জখম, লুঠ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বন্‌ধ, হরতাল, সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ইত্যাদি ঘটিয়ে দেশকে ধর্মের দেহাই দিয়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে মধ্যযুগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ জনগণ জামাতের ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাস মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বাধীনতার শত্রু ইসলামের ধ্বজাধারী জামাতে ইসলামি ও ইসলামি ছাত্র শিবির সংক্ষেপে 'জামাত-শিবির'-এর উত্থান ঘটেছিল ৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর সামরিক শাসনের আমলে। যেহেতু সামরিক শাসকরা ছিল ইসলামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী, পাকিস্তানপন্থী ও ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে, সেহেতু জামাত-শিবিরের উত্থান ও বাড়বৃদ্ধিকে প্রতিহত তো তারা করেইনি, বরং মদত জুগিয়েছে। ফলে বিগত তিন দশকে পাকিস্তান, তলিবান, আলকায়েদা ও বিভিন্ন ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনসহ আরব দুনিয়ার বহু ইসলামিক রাষ্ট্রের আর্থিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মদতপুষ্ট হয়ে জামাত-শিবির আজ পরিণত হয়েছে মহীরুহে। যদিও বাংলাদেশে জামাত-শিবিরের জনসমর্থন ৮-১০ শতাংশের বেশি নয়, তবুও খুনোখুনি, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ তথা সন্ত্রাসমূলক কর্মে এরাই সেরা। জনগণ এদের ভয় করেন। এরা 'ক্যাডার (cadre) ভিত্তিক ও 'রেজিমেন্টেড' (Regimented) সংগঠন হওয়ায় খুনোখুনিতে এরা এতটাই নৃশংস ও পারদর্শী যে, যে কোনও পরিস্থিতিতে মানুষকে গুলি করা বা গলা কাটতে এদের হাত কাঁপে না। বিগত চার দশকে মুক্তি যুদ্ধের শত্রু এই জামাত-শিবির-রাজাকার-আলবদর-আলশামসের জল্লাদদের হাতে অন্তত ১০ হাজার দেশপ্রেমিক মানুষ নিহত হয়েছেন, আহত ও পঙ্গু হয়েছেন প্রায় ৩ গুণ। স্বাধীনতাপ্রেমীদের কাছে এরা খুনী, ঘাতক, রাজাকার, স্বাধীনতার শত্রু প্রভৃতি নামে পরিচিত।

কয়েক বছর আগে বঙ্গবন্ধু-কন্যা তথা আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা পরিচালিত ১৪ দলের জোট সরকার যুদ্ধাপরাধীদের নিরপেক্ষ বিচারের জন্য গঠন করেছিল একটি আন্তর্জাতিক আদালত। সেই আদালতে বিচার চলছিল জামাতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, গণহত্যাকারী, লুটপাট, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের পাণ্ডা কাদের মোল্লার।

আবার এই আদালতেই বিচার চলছে গোলাম আজম (জামাতের আমীর বা প্রধান), দেলোয়ার হোসেন সাঈদি (জামাত নেতা), সলাউদ্দিন কাদের চৌধুরি (মুসলিম লিগ প্রধান)-সহ কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর। এদের বিরুদ্ধে রয়েছে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, পাকসেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা, স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্র ও ক্রিয়াকলাপ এবং মুক্তিযুদ্ধকে 'স্যাবোটাজ' করার অভিযোগ। কিন্তু সম্প্রতি সেই আদালত ওইসব অপরাধে অপরাধী পাকিস্তানে পলাতক বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির আদেশ ঘোষণা করে। অতঃপর আদালত কাদের মোল্লার ফাঁসির পরিবর্তে দেয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আর তারই প্রতিবাদে ওইদিনে পূর্ব ঘোষণামাফিক হরতাল ডেকে ব্যাপক হাঙ্গামা, অন্তর্ঘাত, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও পুলিশকে আক্রমণ করে দেশজুড়ে অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস চালায় জামাত-শিবিরের গুণ্ডারা। সঙ্গে আছে বিএনপি সমর্থকরাও। অপরদিকে, কুখ্যাত কাদের মোল্লার ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ঘোষণা প্রকাশ পেতেই স্বাধীনতাপ্রেমী জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। হাজার খানেক মানুষ পিলপিল পায়ে এসে হাজির হন শাহবাগ চত্বরে। হাতে ব্যানার। লেখা : ''যুদ্ধাপরাধীদের এই রায় আমরা মানিনা, কাদের মোল্লার ফাঁসি চাই।'' একদিকে যখন চলছে দেশজুড়ে এবং ঢাকার প্রায় সর্বত্র জামাত-শিবিরের হিংসাত্মক কাজকর্ম তখন ঢাকারই এক ব্যস্ততম এলাকা শাহবাগে চলছে অহিংসা প্রতিবাদ, ধর্ণা, সত্যাগ্রহ। ৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সেই শুরু। তারপর কেটে গেছে একটি মাস। শাহবাগ চত্বর ছেয়ে গেছে লাখো মানুষের ভিড়ে। প্রতিদিন আসছেন মানুষ, নতুন নতুন মানুষ। শিশু, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ- বৃদ্ধা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা— কে নেই সেই ভিড়ে! বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন বয়সের মানুষের ঢল। সে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মানুষের মুখের আওয়াজে হঠাৎই বদলে গেল নাম। শাহবাগ বনে গেল 'স্বাধীনতা প্রজন্ম চত্বর' বা 'শাহবাগ স্কোয়্যার'-এ। অনেকের মাথায় জাতীয় পতাকার রঙের টুপি, কালো ফেট্টি, হাতে কালো ব্যান্ড। শোকের প্রতীক কালো বর্ণ। জামাত-ঘাতকদের হাতে রাজীব হায়দরের সাম্প্রতিক হত্যার শোকের প্রতীক। শাহবাগের জনজোয়ারে তারুণ্যের প্রাধান্য, অরাজনৈতিক সমারোহ। মঞ্চ বেঁধে চলেছে গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা, নাটক। গীত হয়েছে— এবার বাংলার সলিল চৌধুরি গান (বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে সেই জনতা) এবং কবীর সুমনের গানও --- অধিকাংশই বাংলাদেশের গণসঙ্গীত। বক্তব্য রেখেছেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও সাংস্কৃতিক জগতের পরিচিত-জনেরা। বক্তাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে— বাঙালি জাতির লড়াই, মুক্তিযুদ্ধের কথা আর তারই সুযোগ নিয়ে ফণা তুলেছে স্বাধীনতার শত্রু জামাত-শিবির। সারাদেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বাংলাদেশকে তালিবানী পাকিস্তানে পরিণত করতে চাইছে তারা। স্বাধীন বাংলাদেশ বার বার চাপা পড়েছে সামরিক শাসকদের বুটের তলায়। এদেশে জামাত-শিবিরের ন্যায় স্বাধীনতার শত্রু ও যুদ্ধাপরাধীদের ঠাঁই নেই। জামাত সন্ত্রাসের আতুড়ঘর, মৌলবাদের অন্ধকার। জামাতকে নিষিদ্ধ করতে হবে। তাদের ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন চুরমার করতে হবে। জনজোয়ারের ঢেউ যে শুধু শাহবাগ চত্বরেই আছড়ে পড়েছে তা-ই নয়, দেশের প্রত্যেক শহরে নগরে, গ্রামে-গঞ্জে ঘটেছে গণজাগরণ। ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়লে যেমনটা হয়। ঘর থেকে মানুষ নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে জড়ো হয়েছেন একটি স্থানে। স্লোগান তুলেছেন --- ''রাজকারের ফাঁসি চাই'', ''জামাতকে নিষিদ্ধ করতে হবে'' ইত্যাদি। তাঁরা শাহবাগের প্রতিবাদীদের সঙ্গে জানিয়েছেন সংহতি। যাঁরা এতদিন ছিলেন জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসে সিঁটিয়ে, তাঁরা কোন্ অলৌকিক শক্তিতে-সাহসে উজ্জীবিত হয়ে হলেন এমন দৃঢ়, নির্ভীক ও প্রতিবাদী? এই প্রশ্ন অনেকের।

এদিকে শহিদদিবসের একদিন আগে (২০/২) শাহবাগের ডাকে সারাদেশে লক্ষ লক্ষ বেলুন উড়ল আকাশে, শহিদদের উদ্দেশে। এক একটি বেলুন এক একটি চিঠি। কোনটিতে লেখা : ''তোমরা শান্তিতে ঘুমোও, আমরা জেগে আছি।'' কোনটিতে— ''আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম জেগে থাকব, তোমাদের হত্যাকারীদের ফাঁসি না দিয়ে ঘুম নেই।'' সব চিঠিরই ঠিকানা অনন্ত সুনীল আকাশ। সত্যি এক অভিনব উদ্ভাবন। তাঁরা নিয়েছেন 'Do or die' নীতি।

এবার 'অমর ২১' এসেছে বাংলাদেশে এক নতুন আঙ্গিকে, এক নতুন ইঙ্গিত নিয়ে। মধ্যরাতে ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁতেই মানুষের ঢল নামে শহিদ মিনারে। মুখে গান ''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কী ভুলিতে পারি!...'' দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের বিক্ষোভ-আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দিলেন তিনি। লাখো জনতা গর্জন করে সমর্থন করেছেন সেই ঘোষণাকে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে ইতিমধ্যেই সংসদে 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আইন সংশোধনী বিলটি পাশ হয়ে গেছে। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে— ২৬ মার্চের আগেই জামাতকে নিষিদ্ধ করা হবে। এমনিতেই বর্তমান হাসিনা সরকার নানা সমস্যা ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী দোষে জর্জরিত। তাই বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। কারণ এই অভূতপূর্ব, অপ্রত্যাশিত ও স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণকে কাছে টেনে নিতে না পারলে বা জনজোয়ারকে অস্বীকার করলে মাশুল গুণতে হবে দল ও সরকারকে ভবিষ্যতে। জামাত এখনও বিএনপি-র জোটসঙ্গী। কারণ বি এন পি মৌলবাদী, পাকপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী। এর জন্ম সেনা ছাউনিতে। সেনাশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান এর জন্মদাতা। এই দল শাহবাগ আন্দোলনের পিছনে সরকার, ভারত ও বিদেশের কালো হাত দেখতে পাচ্ছে। তাই জনতা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, গণহত্যাকারী, সন্ত্রাসবাদী, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংসকারী; এরা বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধিতা করে। এরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চালাচ্ছে যুদ্ধ।

তাই প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশ কি গৃহযুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে?

# চিঠিপত্র

## শিল্প ধর্মঘট

গত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি সিপিএম তথা সিটু এবং ব্যাঙ্ক কর্মীদের ডাকা শিল্পধর্মঘট হয়ে গেল। তৃণমূল বলছে বন্ধ ব্যর্থ আর সিপিএম বলছে বন্ধ সর্বাত্মক। অদ্যবধি পশ্চিমবঙ্গে ৩৬ বছরে ৬৭ বার বন্ধ ডেকেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তার মধ্যে তৃণমূল ১৩ বার। প্রশ্ন,বর্তমানে রাজসিংহাসনে বসার পর নেত্রী বন্ধ ডাকা রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু উনি যখন কথায় কথায় বন্ধ ডাকতেন তখন যদি তখনকার শাসক ওই আপ্তবাক্যটি বলতেন তাহলে তো উনি হুলুস্থুল বাধিয়ে দিতেন। উনি তো আগে বলেছেন প্রতিবাদের সাংবিধানিক অধিকারই হলো বন্ধ, হরতাল, ধর্মঘটের মাধ্যম। এর পূর্বে সিপিএম তো ৩০ বার বন্ধ ডেকেছে। তৃণমূলের কোনও অফিসকর্মী, স্কুলের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, পঞ্চায়েত কর্মী ধর্মঘটকে উপেক্ষা করে কাজে যোগ দিলে তাদের প্রহার করা হয়নি, কান কেটে নেওয়া হয়নি, মাইনে কাটার কথা বলা হয়নি যা এবার তৃণমূলের আমলে শুধু করা হয়েছে। হালিশহর, চণ্ডীতলা ও মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীতে এক পঞ্চায়েত কর্মীর কান ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে। সন্তোষপুরে একটি বাজার বন্ধের দিন বন্ধ রাখার ফলে তৃণমূলের হার্মাদবাহিনী ফতোয়া জারি করে ওই বাজারকে ৭ দিন বন্ধ করে দিয়েছে। একটি রুটের ২৫টি অটোকে আপাতত বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ফতোয়া জারী করে। ক্ষমতা হাতে পাবার পর নেত্রী বলেছিলেন তাঁর ক্যাডারদের উদ্দেশ্যে, বদলা নয় বদল চাই। তা বদল হবার পর বদলার এত উপদ্রব চলছে যে মনে হয় রাজ্যে চলছে একনায়িকাতন্ত্রের বিভীষিকা। কারণ একমাত্র সংখ্যালঘু ছাড়া উনি কারও প্রতি মমতাময়ী নন।

**—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।**

## ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম সংখ্যালঘুর সন্ত্রাস

কাশ্মীর, সংসদভবন, মুম্বই, দেগঙ্গা, তেহট্ট, ক্যানিং অবশেষে হায়দরাবাদ। এরূপ আরও অজস্র স্থানে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, গণবিতাড়ন ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ এদেশে কারা করে আসছে এই সোজা প্রশ্নের একটাই সত্য ও সোজা উত্তর--- জঙ্গী সংখ্যালঘুরা। এদেশের মেরুদণ্ডহীন সরকার এদের সংখ্যালঘু বলে হুজুর হুজুর করছে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার এবং কিছু হিন্দু বুদ্ধিজীবী ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোসে যা করে চলছে তা অভিসন্ধিপূর্ণ পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কিছু নয়। বস্তুতঃ এটা দেশের অকল্যাণকর নির্বোধ নীতি। আমরা আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করছি গোষ্ঠী বা ব্যক্তিস্বার্থের জন্য দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিছু স্বার্থপর ও আহাম্মক রাজনৈতিক নেতা। পাছে সংখ্যালঘুরা না খোশ হয় এই ভয়ে তোষামোদের যে নীতি সরকার অনুসরণ করছে তা নির্ভেজাল অন্যায় এবং নিরীহ সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির প্রতি অত্যাচার। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে, অত্যাচার ও অন্যায় সীমা ছাড়ালে একসময় অবশ্যই উৎপীড়িতের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে। বিড়ালও কুকুর দ্বারা দুর্বল আক্রান্ত হয়ে পলায়নের পথ না পেলে এমন ভয়ঙ্কর হয় যে, আক্রমণকারী কুকুরও বিপর্যস্ত হয়। শান্তিপ্রিয় সংখ্যাগুরুরা যদি নিরুপায় হয়ে প্রত্যাক্রমণে বাধ্য হয়, যদি একটা সর্বনাশা গৃহযুদ্ধের শুরু হয় তবে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু সকলেরই কি অমঙ্গল হবে না? এবং সেই দায় কার?

এমতাবস্থায় সংখ্যালঘু বিনিময়হীন দেশভাগ নেওয়া গান্ধী, নেহরুর অদূরদর্শিতা শোধরাতে বর্তমান দেশ চালক নেতারা একটা স্থায়ী সমাধানের সাহসী পদক্ষেপ নিন। দেশকে নিষ্কণ্টক, নিরাপদ করে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে আর কী উপায় আছে?

**—কমলাকান্ত বণিক, দত্তপুকুর, উঃ ২৪ পরগণা।**

## নিউটনের গতিসূত্র

নিউটনের গতিসূত্রের তৃতীয় সূত্রটি হলো : 'প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত।' নিউটন আবিষ্কৃত এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি আমরা প্রায় ভুলেই গেছি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকার জন্য। কোনও ঘটনা যে বিচ্ছিন্ন ঘটনায় এই সত্য যাতে মানুষ ভুলে যায় সেই উদ্দেশ্যেই প্রচার মাধ্যম কোনও একটি বিশেষ ঘটনাকেই বার বার প্রচার করে। কিন্তু ওই ঘটনা যে অপর একটি ঘটনারই প্রতিক্রিয়া তার সামান্যতম উল্লেখও করে না। এখানে আমরা দু-একটি উদাহরণ দিতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল। তার প্রতিক্রিয়াই কি শিখদের উপরে আক্রমণ ও তিন হাজার নির্দোষ শিখের দুঃখজনক হত্যার ঘটনা নয়? প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ঘটনারই প্রতিক্রিয়া কি শিখ দাঙ্গা নয়? যদি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা না হোত তবে কি শিখ দাঙ্গার ঘটনা ঘটত? শিখ দাঙ্গাকারীদের একজনেরও শাস্তি হয়নি। তেমনি গুজরাট দাঙ্গাও যে গোধরাতে ট্রেনের একটি কামরার মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করারই প্রতিক্রিয়া সেকথা প্রচার মাধ্যম কেন প্রচার করে না? গোধরায় ট্রেনের কামরার মানুষদের পুড়িয়ে হত্যা যদি না করা হোত তবে কি গুজরাটে দাঙ্গা ঘটত? ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর ঘটনার জন্যে যেমন দুঃখজনক শিখ দাঙ্গা ঘটেছে তেমনি গোধরার ঘটনার জন্যই গুজরাটের দুঃখজনক দাঙ্গা ঘটনা ঘটেছে। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া এক বৈজ্ঞানিক সত্য। সে সত্যকে অস্বীকার করে প্রচার মাধ্যম ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে সমান গুরুত্ব দেয় না। বরং প্রথম যারা একটা অশুভ ঘটনা ঘটায় তারাই দায়ী প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরবর্তী যে অশুভ ঘটনা ঘটে তার জন্য। প্রধান দোষী তারাই এবং কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার তাদেরই যারা প্রথমে অশুভ ভয়ঙ্কর কোন ঘটনা ঘটায়। আমাদের সংবাদ মাধ্যম, সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা ও বামপন্থীরা গুজরাট দাঙ্গার প্রচার চালান কিন্তু গোধরার ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে যাত্রীদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা সম্পর্কে নীরব থাকেন কেন? গোধরা ও গুজরাটের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি হলো কিন্তু শিখ হত্যার ঘটনায় দোষীদের শাস্তি হল না কেন?

**—কৃষ্ণকান্ত সরকার, দমদম পার্ক, কলকাতা-৫৫।**

# অশনি সংকেত

**শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে**

সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত সংবাদের সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন ভাবে আর এক সঙ্কটের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা কিনা এক অশনি সঙ্কেতের ইঙ্গিতবাহী। যাদবপুর, পার্কস্ট্রীট, কাটোয়া, বারাসাত, আমিনুল কাণ্ড থেকে শুরু করে কলেজে কলেজে অধ্যক্ষ নিগ্রহ ও সাংবাদিক নিগ্রহে সরকারের মুখ তো পুড়েইছে, কিন্তু গার্ডেনরিচে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ইকবাল কাণ্ড ও তদ্‌দ্ভুত পরিস্থিতিতে পচনন্দার অপসারণ সকল ঘটনাকে টেক্কা দিয়েছে। মোক্তার ধরা পড়লেও ইকবাল এখনও অধরা। অবশ্য তাকে সারেন্ডার করানোর জন্য বিভিন্ন মহল থেকে তৈলমর্দন অব্যাহত। বঙ্গের আমজনতা, সুশীল সমাজ এমনকি রাজ্যপাল মহোদয়ও এ জিনিস বরদাস্ত করেননি, তা বলাই বাহুল্য। বাংলার এক সামান্য নাগরিক হিসাবে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের তরফে গার্ডেনরীচ কাণ্ডের উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকত সাহেব বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নাকি তার কথা হয়ে গেছে, কোট আনকোট— সরানো হবে না ফিরহাদ হাকিমকে (ববি)। ফিরহাদ একজন দক্ষ মন্ত্রী। গার্ডেনরীচ কাণ্ডের জের টেনে বিরোধীরা তাকে যে মন্ত্রিত্ব থেকে সরানোর দাবী করেছেন তা এক কথায় নস্যাৎ করে দিলেন বরকাতি সাহেব। তিনি আরও বলেন, কোট আনকোট— তিনি নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিতিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। মুসলিমরাই নাকি তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন। বরকতি সাহেবের দাবী— কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপির পাশাপাশি মিডিয়ার একাংশ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে ইত্যাদি প্রভৃতি। এবিপি আনন্দে প্রচারিত সংবাদটি আমি নিজে দেখেছি। দেখে যেমন শিহরিত হয়েছি তেমনি আশঙ্কিতও হয়েছি এক অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। প্রশাসনে যদি এভাবে কোনও ধর্মীয় প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে তার পরিণতি বিষময় হতে বাধ্য।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকলের কথা শুনতে হবে একথা ঠিক, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ মানে তো সংখ্যালঘু তোষণ নয়। দেশে সরকারি প্রশাসন চলে সরকারি নিয়মে সরকারি পরিকাঠামোয়, তারপর রয়েছে আইন-আদালত। এর বাইরে পাটিতন্ত্র বা কোনও ধর্মীয় সংগঠনের অঙ্গুলি হেলনে ঘটে তবে আমরা কোন পরিণতির দিকে দেশটাকে নিয়ে যাচ্ছি। এর মধ্যেই একটা বহুবিতর্কিত সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে নেওয়া হয়ে গেছে, যেমন ইমাম ভাতা ও সংখ্যালঘু হাসপাতাল নির্মাণ। জনগণের টাকা এভাবে হরির লুট দিয়ে কোনও সম্প্রদায়কে তোষণ করা যায় কী? শুধু তোষণ করে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে কিছু পাইয়ে দিয়ে তাদের প্রকৃত কোনও কল্যাণ করা যায় কী? সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে কোনও কোনও পিছিয়ে থাকা সমাজের প্রতি বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু অসাংবিধানিক পথে নেওয়া যায় কী? এর জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কন্টিনুয়াস প্রসেস্-এর মাধ্যমে যেতে হবে।

বরকতি সাহেবকে এত বড় ক্ষমতা সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা জানি না, যদি না হয় তবে অতি সত্বর এর প্রতিবিধান করা উচিত, নচেৎ ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। তখন নিয়ন্ত্রণ করাও কষ্টকর হয়ে উঠতে পারে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের আমজনতা আশাতীত ভাবে ঢালাও সমর্থন দিয়েছে, তাদের অনেক আশা, সেই আশায় এভাবে জল ঢাললে আমজনতার মোহভঙ্গ হতে দেরী হবে না। পরিবর্তনের পক্ষে সামিল হওয়া অনেক বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ সকলেই আজ কিন্তু আপনার পাশে নেই, — মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে কি এটা আদৌ ভাবায়? মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আপনি কেন সিপিএম-এর করা ভুলগুলো অবাধে করে চলেছেন? শিক্ষাক্ষেত্রে অনিলায়ন যেমন শিক্ষা জগতের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল, আপনি তার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে কেন পারছেন না?

পজেটিভ বা গঠনমূলক সমালোচনা কেন সহ্য করতে পারেন না? বিরোধীদল সব সময়ই গণতন্ত্রের ফুসফুস, আপনি তাদের নিয়ে কেন বসতে পারেন না? বাংলার সামগ্রিক বিকাশে সরকার— বিরোধী পক্ষ কেন একসঙ্গে বসতে পারবে না? গুজরাট পারলে আমরা কেন পারবো না?

আর একটা কথা অতি বিনয়ের সঙ্গে বলেছি, আর দেরী না করে আপনি দলীয় শৃঙ্খলার দিকে নজর দিন, প্রয়োজনে কঠোর হন। আগাছা ছেঁটে দলকে একটা পরিশীলিত রূপদান করুন। কারণ শুদ্ধিকরণ আপনার দলেও ভীষণভাবে জরুরি। নাগরিকদের মধ্যে কোনওরূপ ধর্মীয় বিভাজন কখনই কাম্য নয়। 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস' এবং বহু গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ তার বহু গ্রন্থে বলেছেন— ধর্মীয় বিভাজনে ১৯৪৬ সাল থেকে বাংলার বুকে অনেক রক্ত ঝরেছে, আর যেন না ঝরে। ১৯৪৭ সালের ক্ষত আজও আমরা বয়ে চলেছি।

# তারকনাথের আগে বাবা লোকনাথ

**উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল**

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শৈবতীর্থ তারকেশ্বর বা তারকনাথ। এই তারকনাথের আগে পড়ে লোকনাথ স্টেশন। আসলে বাবা লোকনাথ শিবের নামেই স্টেশনের নাম। স্টেশন থেকে পূর্বদিকে কিলোমিটার খানেক গেলেই বালিগুড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পড়ে লোকনাথধাম।

মন্দিরের সামনে এক কুণ্ড। ভক্তরা এখান থেকে জল নিয়ে মাথায় দিয়ে শুদ্ধ হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে। মন্দির উচ্চতায় ছোট্ট, দৈর্ঘ্য ২২ ফুট। চারচালা শ্রেণির স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। মন্দিরে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য দুটি দরজা। গর্ভগৃহ অপ্রশস্ত। মেঝের যোনিপীঠের মাঝে লোকনাথ শিবের অবস্থান। দশ ইঞ্চি উচ্চতা যুক্ত, কালো, অমসৃণ, 'নাগেন্দ্র হারায়' বাবার লিঙ্গ-শরীর। পর্যটক এবং লেখক গৌতম ঘোষের মন্তব্য : ''হিমালয়ের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন রেঞ্জে যে ক'টি শিবলিঙ্গ দেখেছি সেগুলি প্রত্যেকটি এই রাঢ় অঞ্চলের লোকনাথ শিবলিঙ্গেরই অনুরূপ।''

তারকনাথের মতোই বাবা লোকনাথও স্বয়ম্ভু। স্থানীয় মানুষরা লোকনাথকে বাবা তারকনাথের 'বড়দাদা' বলেই অভিহিত করেন। এসব অবশ্য মানুষের মনগড়া কথা। পৌরাণিক হয়েও রাঢ় অঞ্চলে শিবের যে একটা লোকায়ত রূপ আছে, মানুষের এ জাতীয় ভক্তি বিশ্বাস থেকে তা পরিস্ফুট। আসলে এক বিশ্বনাথ স্থানভেদে বিভিন্ন রূপে বিরাজিত।

লোকনাথ সম্পর্কে স্থানীয় মানুষ অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ। এই ভক্তির সঙ্গে কিছুটা ভীতিও মিশে আছে। তার কারণ, বাবা কৃপাময়, পরম দয়ালু। শরণাগতের ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেন। কিন্তু এখানে বাবার যোগেশ্বর রূপ। বাবা নির্জনতাপ্রিয়, যোগমগ্ন। তাই, দিনে যা-ই হোক, রাত্রিতে কেউ বাবার ধারে কাছে অবস্থান করতে পারে না। কেউ কেউ বাবার কাছে রাত্রিবাস করতে চেয়েছে; কিন্তু পারেনি। বাবার ভয়ে মন্দির-চত্বর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ব্যতিক্রম একজনই। তিনি রেঙ্গুনবাসী এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। বাবার কাছে যিনি হত্যা দেন— সারাদিন-রাত জুড়ে। এবং শেষ পর্যন্ত বাবার কৃপালাভ করেন। মতান্তরে রেঙ্গুনবাসী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বাবা কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানে আসেন। তিনিই ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে বাবার বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। মন্দিরের সামনে বসে যাঁরা পূজার উপকরণ ফুল, বেলপাতা, ধূপধুনো বিক্রি করেন এসব কথা তাঁরা

বংশপরম্পরায় শুনে আসছেন এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের বলে চলেছেন।

এখানে ভিড় বলতে হয় শ্রাবণী মেলায়। কারণ, তারকনাথের আগেই বাবা লোকনাথ। এবং সাধারণ মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস অনুযায়ী, তারকনাথের বড়দাদা লোকনাথ। তাই, ভাইয়ের মাথায় জল ঢালার আগে দাদার মাথায় জল ঢালাই দস্তুর। এর অন্যথা সাধারণত হয় না। শ্রাবণী মেলার এই সময়টুকু ছাড়া এখানে বিশেষ ভক্তসমাগম হয় না, ফাঁকাই থাকে। তাই সুষ্ঠুভাবে পূজা দেওয়া হয়। পুরোহিতদেরও বিশেষ দাবি-দাওয়া নেই। ভারী সুন্দর পরিবেশ।

বাবা লোকনাথের মন্দির ছাড়া আছে মা পার্বতীর মন্দির এবং মহাবীরের মন্দির। মন্দির থেকে দু-পা এগিয়ে গেলেই একটা শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কানা দামোদরের একটি শাখা। বর্ষার সময়টুকু ছাড়া বছরের অন্য সময় শীর্ণ এবং নিঃস্রোতা। নদীর দুই তীরে নানা গাছগাছালি। এক বৃহৎ শিমুল গাছ। শিমুল গাছের পাশেই মা কালীর মন্দির। লোকে বলে, শ্মশানকালী। কিন্তু শ্মশানকালী হলেও মায়ের চেহারায় ভয়ঙ্করতা নেই, বরং মায়ের শ্যাম স্নিগ্ধ চেহারার মাধুর্য মনকে ভক্তিবনত করে। এখানেও নিত্য পূজা হয় এবং তা হয় নিষ্ঠায়।

বাবা লোকনাথ শিব দর্শনের পর শ্মশানে এসে শ্মশানবাসিনী শ্যামা মায়ের দর্শনে পূর্ণ হয় এই শৈবতীর্থ পরিক্রমা।

# অন্তর্মুখী সাধক

**নবকুমার ভট্টাচার্য**

শান্ত স্নিগ্ধ মুহূর্তটি প্রায়ই হেলায় কাটাই আমরা। তাকে কাজে লাগতে পারলে, এই অনুকূল অবস্থার সদ্ব্যবহার করতে পারলে মানুষের কল্যাণ করা যেতে পারে। সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো মানুষের কল্যাণ করা, মানুষের উপকার করা। আর যাঁর মনে এবং প্রাণে ভগবানের ভাব উদয় হয় তিনিই প্রকৃত সাধক। ব্রহ্মময়ীর সাধনার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আনন্দময়ীকালীকে। এই মায়ের সঙ্গেই ছিল তাঁর নিত্যসম্বন্ধ। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে মায়ে পোয়ে কথা হোত। মায়ের চরণের চিহ্ন আজও রয়েছে মন্দিরে। আসলে কখনও কখনও সাধনার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না কেবল তাঁর কৃপাতেই তাঁকে পাওয়া যায়। মুরারি ঘোষালও মায়ের কৃপা পেয়ে ছিলেন, তাইতো তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনেকের আস্থার মানুষ। তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তবে জ্যোতিষের নামে আজকের অনৈতিকতাকে ঘৃণা করতেন। উপায় করেছেন বহু অর্থ, কিন্তু দানও করেছেন সমানভাবে। তবে সৎপাত্রে। তিনি মনে করতেন, ভগবান কাউকে অর্থ দেন কিন্তু দান করবার ইচ্ছা দেন না। আবার যাকে দান করবার ইচ্ছা দেন কিন্তু অর্থ দেন না। যাকে দুই-ই দেন, বুঝতে হবে সেখানে মায়ের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। অর্থ থাকবে অথচ সদ্বুদ্ধি হবে এটাই তো মায়ের কৃপা। সারাটা জীবন অর্থ, সাধুসঙ্গ আর আনন্দময়ী মায়ের সেবা করে কাটিয়েছেন। তাঁর মতে সাচ্চা কাজ করলে সে কাজ চলবেই চলবে— জুয়াচুরি কোনও কালেই চলবে না।

বীরভূমের আটলা গ্রামের গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে অনেকেই চিনতেন স্মার্ত পণ্ডিত হিসেবে। কিন্তু তিনি যে তারা মায়ের একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন একথা অনেকেই জানতেন না। তাঁর ডাকে স্বয়ং মা-তারা কৃপা করতেন। বহু মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে বাঁচিয়েছেন মায়ের কৃপায়। কলকাতার দুর্গাদাস স্মৃতিতীর্থ, পূর্ব মেদিনীপুরের পঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ, হাওড়ার নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ এঁরা প্রত্যেকেই গৃহী কিন্তু সাধনার ভিত এঁদের অনেক মজবুত। সাধনা তো হয় মনে মনে। স্বামী শিবানন্দ স্বামী তো তাই বলেছেন, মুক্তির অনুসন্ধানে বাইরে কোথাও যেতে হয় না, নিজের ভেতরেই তা সদা বিদ্যমান। দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সেজন্য ধ্যানট্যান সব শরীরের ভিতর গৃহে বসেই করা যায়। দেহের ভেতর যিনি রয়েছেন, তাঁর দুঃখ কষ্ট কিছুই নেই। তিনি আনন্দস্বরূপা। প্রত্যেকের দেহের ভেতরই তিনি রয়েছেন। প্রত্যেকের স্বরূপই হলো তাই। সেই স্বরূপকে উপলব্ধি করার নামই সাধনা। সংসারে এরকম অচেনা অজানা সাধকের সংখ্যা খুব একটা কম নয়।

*ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত*

অনেকেই তাঁকে চেনেন না। আমরাও কি তাঁকে ঠিক ঠিক চিনতে পেরেছি। তিনি নিজেও নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেননি কিন্তু তবুও দৈবক্রমে তাঁর প্রভা প্রকৃতিকে আলোকিত করেছিল। যে যত বড় সে নিজেকে তত বেশি গোপনে ও নির্জনে রাখতে চেষ্টা করে। হাওড়া জেলার ধামসিয়া গ্রামের মুরারি ঘোষালও এমন একজন মানুষ যিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখতেই পছন্দ করতেন। আসলে সাধন ভজনের দ্বারা মন সংস্কৃত হলে তখন সে মনে ভগবানের দিব্য অনুভূতি হয়। সেই অনুভূতিই হলো আসল অনুভূতি। এর ফলেই নিজের স্বরূপকে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। জন্মে ছিলেন এমন এক পরিবারে যে পরিবারের সামর্থ্য ছিল না তেমন কিছুই। না বিত্তের না প্রাচুর্যে। তাই ছোটবেলা থেকেই দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে নিজেকে তৈরি করেছিলেন, আর বুঝেছিলেন যে মনে সংগ্রাম নেই সে মন মৃত। সাবধানীকে প্রারব্ধ কাতর করতে পারে না। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকেই পথ খুঁজেছিল অন্যধারার সন্ধানে। মিলেও গিয়েছিল পথের সন্ধান। এক অন্য ধরার সাধনা। পাহাড়ী বাবা, লাহিড়ী মহোদয় যে পথের অগ্রদূত ছিলেন, তিনি হলেন সেই পথের উত্তর পুরুষ। মাতৃকাভেদ তন্ত্রে যে সাধনার ধারা সম্বন্ধে দিকনির্দেশ রয়েছে। আমাদের জীবন হলো এক প্রবহমান নদী। অবিরাম তার গতি প্রবাহ, নিরন্তর তার পরিণাম। জীবনে রয়েছে নানা উপাদান— মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেহ ইত্যাদি। মনের গতি বা বুদ্ধির গতি এত সূক্ষ্ম যে সহজে আমরা তা ধরতে পারি না। মন যখন শান্ত, সুস্থির স্নিগ্ধ থাকে তখন তার এই স্বচ্ছন্দ ভাবটা ধরা তত কঠিন নয়, অথচ সেই বিরল

# প্রযুক্তির বেশে আধ্যাত্মিকতা

**নীতিন রায়**

ট্রেনটা ছুটে চলেছে হাওয়া কেটে। ট্রেন যাত্রায় একটা সংস্কৃতি আছে। উদাসীন কেউ, কেউ হইচই-এ মত্ত। একটি ছেলে উদাসীন ভাবে বসে আছে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, হুঁ হা উত্তর দিচ্ছে। কেতাদুরস্ত। মনে হয় কোনও কোম্পানীতে বড় চাকুরী করে। বয়স ২৭/২৮ আবার হাতে দামী মোবাইল, মোবাইল বেজে উঠলো। গায়ত্রীমন্ত্র লোড করা, কথা বলেই শ্যামাসঙ্গীত শুনতে লাগলো। আমার মনে হলো আলাপ জমানো দরকার।

আলাপ জমাতেই বললো সে প্রযুক্তিবিদ। অফিসের কমপিউটারে রয়েছে মা দুর্গার ছবি। হনুমান চালিশা থেকে ভগবত গীতা লোড করা আছে মোবাইল-এ। যখনই মন বিচলিত হয় তখনই শোনেন। আবার সকালবেলায় গীতা পাঠও মোবাইল থেকে শোনেন।

প্রযুক্তির সঙ্গে ধর্মের মিশেল। প্রতিটি সময়ের একটি আধুনিক যুগ আছে। সেই খুঁজে নেয় পথ। প্রযুক্তি আবেগ কেড়ে নিয়েছে কিন্তু দিয়েছে আধ্যাত্মিক জগতের প্রযুক্তিকরণ।

সেই ছেলেটির নাম সৌম্য। সৌম্য বললো— ''আমরা বড় হচ্ছি নিউক্লিয়াস ফ্যামিলিতে, ঠাকুরদার কোলে বসে যেগুলো শুনতে পারতাম সেগুলো শোনা হয়নি। তাই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে হট লাইনে যোগাযোগ করে দিয়েছে। অনেকে গুরুর ছবিসহ কার্যক্রম ধরে রাখে। অবসর সময় দেখে যখন মন অস্থির হয়ে যায়, চারিদিকে অবসন্নতার ছাপ তখন প্রযুক্তির কাছে ফিরে যাই। আধ্যাত্মিকতার প্রযুক্তিকরণ মনকে চাঙ্গা করে।

মন্দিরে যাওয়ার সময় নেই, সময়ও যদি পাওয়া যায় লাইন দিতে হবে। প্রযুক্তি সময় বাঁচিয়ে দিল। আবার সহজেই ঈশ্বরের জগতে প্রবেশ করা যায়। 'এ যুগের শহুরে ছেলেরা আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছে। তাই মন্দিরে দর্শনার্থীর ভিতর ৭০ শতাংশ বয়স ৩০ এর নীচে।' — মুম্বাই-এর সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরের চেয়ারম্যান সুভাষ মেয়েকার বললেন। এই মন্দিরের দেবতার ছবি দেওয়া আছে ওয়েভসাইটে, খুললেই দেব দর্শন।

প্রযুক্তি ও ধর্ম মিশে গিয়ে ধ্যান ধারণাও পাল্টে দিচ্ছে। প্রি-প্রোগ্রাম অডিও ভিস্যুয়াল ব্যবহারকারীর জানা ভাষায় পাল্টে যাচ্ছে। আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তিত নমুনা মাত্র। বোম্বের ফ্যাশন ডিজাইনার নিধি গোয়েল (২৯) বললেন, তিনি আই পড ও স্মার্ট ফোনে সকালে ভজন কীর্তন শোনেন। তাই মন্দিরে

**টেলিভিশনে দিন দিন ধর্মভিত্তিক সিরিয়াল বা ধারাবাহিক বেড়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই রেডিওর বেসরকারী চ্যানেলে নানা রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তাই স্বামী রামদেব, শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের পায়ে হাজার হাজার যুবক নিজেকে সমর্পণ করে তৃপ্তি পেতে চাইছে।**

লাইন দেওয়ার দরকার নেই তার। ধর্মাচরণ এখন অনেক সহজ বোধগম্য হয়েছে। আবার সময় বাঁচিয়ে ঈশ্বরের নাম নেওয়া যাচ্ছে। দিল্লী ইনসটিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সঞ্জয় শ্রীবাস্তব বললেন, ''আধুনিক সমাজ তার ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করছে তার প্রয়োজনে। আধুনিক সমাজে হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তরণ। প্রতিটি আধুনিক সময় তার ঐতিহ্যের খোঁজ করে।''

আধ্যাত্মিক গুরুরা অনলাইনে প্রবচন দিচ্ছেন। নিথিয়া শান্তি পুনের ৩৪ বৎসর বয়সী নাগরিক। তার ১০০০০ শিষ্যের সঙ্গে তিনি ফেসবুকে নিত্য সম্পর্ক করেন। আজকের যুবকেরা নানা সম্পর্ককে ঘিরে উত্তেজিত, হতাশায় ভুগছে। আধ্যাত্মিকতা তাকে মুক্তির পথ দেখায়, ২৫ থেকে ৩৪ বৎসর বয়সী যুবকেরা তার পেজ খুলে শান্তি খোঁজে।

নতুন যুগের ভাবনায় ইসকন গান, গল্প ও নৃত্যের মাধ্যমে গীতাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এই ভাবে গীতা আস্বাদনের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

অজিত বাড়িতে যজ্ঞ ও জন্মাষ্টমী পালন করেছে। নানা জায়গা থেকে বন্ধুরা এসেছে, আনন্দে থেকেছে। অজিতের ভাষায় বাড়ি গাড়ি অর্জন করেও যখন শান্তি পাওয়া যায় না, তখন সামান্য পূজা ও যজ্ঞে যেন প্রশান্তি মেলে। তাই হয়তো ২০১২ সালের গৃহস্থবাড়ির ভোগ্যপণ্য সরবরাহের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে শহরে ১০০০ জনের মধ্যে ৭১১ জন আগরবাতি (ধূপ) কেনে। আর গ্রামে ১০০০ জনে ৬৭০ জন আগরবাতি কেনে। প্রিয়াঙ্কা প্যাটেল মুম্বাইয়ের এক মনস্তত্ত্ববিদ। তিনি লুকিং গ্লাস নামে একটি সংস্থা তৈরি করেন। সেখানে অনেক যুবক আসে। তারা প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় থেকে পালাতে চায়। লক্ষ্ণৌয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (IIM) একটি কোর্স চালু করেছে ছয় বৎসর ধরে। তার নাম 'ফ্রেমিং আইডেনটিটি এবং তার ভূমিকা'। এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা আধ্যাত্মিকতার গভীরে যেতে চাইছে। বস্তুগত সাফল্যের চেয়ে জীবনের মূল অনুভূতি লাভে গুরুত্ব দিচ্ছে। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ধর্ম ও কর্মের সহবস্থান সাফল্য এনে দেবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, কর্মের মাধ্যম যদি ধর্ম হয় তবে সাফল্য আসবে। ব্যক্তি যদি আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হয় তবে তার কাজে আনন্দ আসবে। নৈতিকতাপূর্ণ কর্ম বেড়ে যাবে। আধুনিক ভারতের যুব সমাজ প্রতিযোগিতার দৌড়ে আধ্যাত্মিকতার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা চাইছে। সমাজ তার দিকে এগুচ্ছে। তার প্রতিফলন ঘটেছে প্রযুক্তিগত আধ্যাত্মিকতার উপর। আধ্যাত্মিকতার প্রযুক্তিকরণ যুব সমাজের ধর্মের চাহিদা মেটাচ্ছে। টেলিভিশনে দিন দিন ধর্মভিত্তিক সিরিয়াল বা ধারাবাহিক বেড়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই রেডিওর বেসরকারী চ্যানেলে নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তাই স্বামী রামদেব, শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের পায়ে হাজার হাজার যুবক নিজেকে সমর্পণ করে তৃপ্তি পেতে চাইছে।

# হোতুর বন্ধু দীপন

বন্ধু বাড়াবার কথা সবসময় বলে হোতু। ভালো বন্ধু পাওয়া কঠিন। পেলে সব অন্যরকম হয়ে ওঠে। স্কুলের বন্ধুদের কথা কখনও ভোলা যায় না। বড়ো হওয়ার পর ছোটোবেলার কথা বার বার মনে পড়ে। কখনও কখনও মন বলে ওঠে, 'ছেলেবেলার দিনগুলিই ছিল চমৎকার। বড়ো হওয়া মানেই যত ঝামেলা।' ছোটোবেলার দিন শেষ হয়ে যায় খুব চটপট। ছোটোরা বড়ো হয়ে নানারকম দায়িত্ব নেয়। নিজেদের গড়ে তোলে। তাদের আগলে রেখে পথ করে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে বড়োদের। হোতুর মনে পড়ে পুরনো দিনের

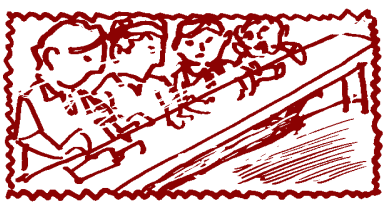
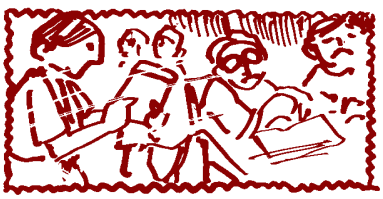

কথা। একটার পর একটা ছবি ভেসে ওঠে। কত হইচই খেলাধুলো নাচগান, সকলে মিলে মেতে থাকা। মাতিয়ে রাখা। বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে টিফিন খাওয়া, পড়াশোনার মধ্যে মজা। স্কুলের সব ছেলের বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। হোতু বলেছিল তার মাকে, 'দীপনের বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। ও কোনওদিনই বাড়ি থেকে টিফিন আনে না। সকালে কতটা খেয়ে আসে জানি না। তুমি আমার জন্যে খাবার তৈরি করে দাও। একটু বেশি করে দিলে দুজনে খেতে পারি। তুমি দেবে মা?' হোতুর মনে পড়ে, মা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'আমি খুব আনন্দের সঙ্গে তোদের দুজনের জন্যে খাবার করে দেবো। ভাগ করে নিয়ে খাস দুজনে।' মা সপ্তাহের পাঁচদিন টিফিন কৌটো ভর্তি করে খাবার দিত। একরকম নয়। একেকদিন একেকরকম খাবার। শনিবার স্কুল ছুটির পর হোতু বাড়ি ফিরত দীপনকে সঙ্গে নিয়ে। দুই বন্ধুকে একসঙ্গে খেতে দিত মা। বলত, 'দীপন, একটুও লজ্জা করিস না। তোরা দুজনে ভাই।' হোতুর বাবা বলেছেন, 'যে কোনও প্রয়োজনে আমাকে বলবে।' হোতু আর দীপন একসঙ্গে খেলত, পড়ত।

দীপনের বাবা একটা সামান্য চাকরি করতেন। শরীরও ভালো থাকত না অনেক সময়েই। তাঁর আয় খুব কম থাকায় দীপনের পড়াশোনা চালানো কঠিন হয়ে উঠেছিল। স্কুলের মাস্টারমশাইরা সহযোগিতা করেছেন দীপনকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। ওর বাবাকে বলেছেন, 'পড়াশোনার ইচ্ছেটা যখন দীপনের রয়েছে, ওকে এগিয়ে যেতে সকলে মিলে সাহায্য করা দরকার। আপনি একটু কষ্ট করুন। আমরা ওর সব দায়িত্ব নিচ্ছি।' দীপন এগিয়ে গেছে একের পর এক বাধা পেরিয়ে। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় দীপন দারুণ রেজাল্ট করেছিল। হইহই ব্যাপার। দীপন শান্ত স্বভাবের ছেলে বরাবরই। হেডস্যার বলেছিলেন, 'এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তোমার মনের জোর আজকের মতো রাখতে হবে আগামীদিনে।' তার বাবা মাকে বলেছেন। সকলের শুভেচ্ছা ঘিরে রেখেছিল তাকে। দীপন দিশেহারা হয়নি। সে তার লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে গেছে। দীপন একটার পর একটা পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করেছে। তার সামনের পথ চওড়া হয়ে গেছে। পড়াশোনার খরচ লাগেনি তার কোনও সময়েই।

হোতু পড়াশোনা শেষ করে পারিবারিক ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। দীপন আমেরিকায় পড়তে গেছে। দেশে ফিরে বড়ো চাকরি পেয়েছে। আমেরিকায় থাকার পরিকল্পনা তার ছিল না। বাবা মাকে নিয়ে এক জায়গায় আনন্দে থাকার ব্যবস্থা করেছে। হোতুর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক দীপনের। দুজনে দেখা হলেই গল্প যেন শেষ হতে চায় না। ফিরে ফিরে আসে মাস্টারমশাইদের কথা। সহপাঠীদের কথা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে চিত্রমালা। সেসব দিন আর ফিরে আসবে না। শুধু স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

দীপন অনেক বছর ধরেই খুব ব্যস্ত মানুষ। হোতু তাকে বলেছে, 'তোর কাছ থেকে আমরা পরামর্শ চাইবো সবসময়। ছোটোদের বড়ো হওয়ার জন্যে তুই কিছু কথা বলবি। ছোটোরা উৎসাহ পাবে তাতে।' দীপন রাজি হলো। সে বন্ধুর মতোই কথা বলল সকলের সঙ্গে। প্রত্যেককে দিল একটা করে বই নোটখাতা কলম। সে বলল, 'সংকট সমস্যা আছে। সবাই মিলে এগিয়ে যাওয়া যায়। যদি বন্ধুরা একে অন্যের কথা ভাবি।' দীপন বলতে চেয়েছিল, ছেলেবেলায় হোতুদের বাড়ির কথা জানাতে। হোতু বারণ করেছিল। বলেছিল, 'সেদিন ছিলি বন্ধু। আজও বন্ধু। আমরা এখনও বন্ধু রয়েছি। দুজনে মিলে ভাবতে পারি চারপাশের ছোটো ছোটো বন্ধুদের জন্যে কি কি করা যায়।'

দীপন রাজি। ওরা কিছু কাজের কথা ভাবল। হোতু তার খুব কাছের কয়েকজনকে ডেকে নিল। যাদের সঙ্গে নানারকম কাজ করে সে আনন্দ পায়। অর্জুনের সঙ্গে দীপনের পরিচয় করিয়ে দিল হোতু। অর্জুন বলল, 'আপনারা পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধু। খুব ভালো বন্ধু। একটা ছবি তুলতে চাই একসঙ্গে দুজনের।'

দীপন বলল, 'অবশ্যই।' হোতু হাসল।

**কৌশিক গুহ**

*ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত*

## বই কথা কই

### বইয়ের সঙ্গে বড়ো হওয়া



দাদুর ঘরে বসে একমনে উল্টো করে বই ধরে পড়ত রিয়া। দাদু নিজের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে জিগগেস করত, 'দিদিভাই ভালো লাগছে তো বইটা?' রিয়া বই থেকে মুখ না নামিয়ে বলত, 'তোমার কাজ তুমি করো, আমার কাজ আমি করছি।' দাদু হেসে বলে, 'ঠিক আছে। তুমি পড়ো।' নাতনির পড়া-পড়া খেলা দেখে মন ভরে যেত দাদুর। একসময় ওর বাবা ওইভাবে পড়ত। পিসিও। তারা বড়ো হলো চোখের সামনে। রিয়ার বাবা কলেজে পড়ায়। পিসিও প্রচুর পড়ে প্রতিদিন। এক স্কুলে পড়ায়। মন দিয়ে নিজের কাজ করে। স্কুলে খুব সহজ করে পড়া বুঝিয়ে দেয় প্রত্যেককে। ছাত্রীরা আনন্দে বলে, 'দিদি, আজ একটা গল্প বলবেন।' পৌলমীর গল্পের ভাণ্ডার দিনে দিনে ভরে উঠেছে। ছোটো থেকেই বই পেয়েছে বাবা মা দাদু ঠাকুমা মামা কাকা মাসি পিসির কাছে। স্কুলের পড়ার থেকে গল্পের বই বেশি পড়ত বলে মা রাগ করত। বাবা বলত, 'পড়ুক। নানান বই দেখুক।' এখন পৌলমীর মা নাতনিকে পড়ায় উৎসাহ দেয়। রিয়ার কাছে গল্প শুনতে চায়। ঠাকুমাও অনেক গল্প বলে। কোনও কোনও পছন্দের গল্প বার বার শুনতে চায়। পিসির সঙ্গেও রিয়ার খুব ভাব। পিসিমণি যখনই আসে তার জন্যে বড় চকোলেট আর বই আনে। দাদু ঠাকুমাকে ভেঙে দেয়। সবাইকে দিয়ে খাওয়ার অভ্যেসটা তার আছে। ঠাকুমা বলে রিয়াকে, 'পিসিমণি একেবারে তোর মতো ছিল ছোটোবেলায়।' রিয়া জিগগেস করে পৌলমীকে, 'তুমি আমার মতো ছোটো ছিলে?' পৌলমী ভাইঝিকে আদর করে বলে, 'ঠাকুমাকে জিগ্যেস করো।' দাদুর কাছে বাবা পিসিমণির ছোটোবেলার অনেক বই আছে। রিয়া মাঝে মাঝে দেখে।

**বইমিত্র**

## প্রশ্নবাণ

১. সিমলিপাল, গোলকুণ্ডা দুর্গ, অমরকন্টক, পানাজি, সুরাট— ভারতের কোন্ রাজ্যে?

২. মেঘালয়— কোন্ সময়ে জন্ম? রাজধানীর নাম?

৩. কেরল-এর রাজধানীর নাম?

৪. জয়সলমীর, মথুরা, রাজঘাট, মাণ্ডী, শোনমার্গ— কোন্ রাজ্যে?

৫. জসিদি, রাজগীর, গ্যাংটক, আইজল, কাঞ্চিপুরম— কোথায়?

**উত্তর :** ১. ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, গুজরাট। ২. ১৯৭২। শিলং। ৩. তিরুভনন্তপুরম (ত্রিবান্দ্রম)। ৪. রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর। ৫. ঝাড়খণ্ড, বিহার, সিকিম, মিজোরাম, তামিলনাড়ু।

## ছবিতে তফাত খোঁজ





## উলটো পালটা

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়ফট্টাই বেশি। সবজান্তা সাজা পছন্দ করে। আসলে কুয়োর ব্যাঙ। মনকে একেবারে সংকীর্ণ করে রেখে নিজের স্বার্থ গোছাতে সবসময় তৈরি। অন্যের কাছ থেকে যখন যা পাওয়া যায় তা হামলে পড়ে বাগিয়ে নেয়। কাউকে কিছু দেওয়ার সময় নানারকম অজুহাত দেখায়। একটা চাকরি বাগিয়েছিল ওইভাবে। কাজের জন্যে অনেক বছর দিল্লীতে ছিল। কলকাতায় মা-ভাইবোনেরা। প্রথমে বছরখানেক বাড়িতে টাকা পাঠিয়েছিল। তারপর খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করেছিল। বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করেছে ভাই প্রশান্ত। চাকরি শেষ হওয়ার পর সুশান্ত ফিরে এলো কলকাতায়। সঙ্গে তার বউ মিলি। আশপাশের লোকজন বলল, 'নাম সুশান্ত। মোটেই সুশান্ত নয় আচার-ব্যবহারে।' তার বউ মিলি কারও সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে না। মেয়ের নাম খুশি। সে নিজেরটুকু বুঝে নিতে শিখেছে বাবামায়ের কাছে। তাতেই খুশি। সুশান্ত এখন বলছে, ওই বাড়ি প্রোমোটারকে বিক্রি করে দিতে। তার ভাই চুপচাপ সব লক্ষ্য করছে।



২

মাসে মাসে বিয়ের নেমন্তন্ন থাকে চিত্ত সিংহের। দোকানে কয়েকটা শাড়ি বাছার পর একটা পছন্দ হলো। দাম ১০০ টাকা। ছাড় মিলল ১৫ শতাংশ। ৮৫ টাকা। চিত্ত বলল, '১০০ টাকা দামের শাড়ি কিনছি, মাত্র ১৫ শতাংশ কমিশন!' দোকানদার বলল হেসে, 'ঠিক আছে। দামের স্টিকার বদলে ২০০ টাকা করে দিলাম। পঁচিশ শতাংশ ছাড় দিচ্ছি। লাভই হলো আপনার কি বলুন!' চিত্ত সিংহ শাড়িটা কিনে বাড়ি ফিরল। যেটা ৮৫ টাকা পাওয়া যাচ্ছিল সেটা কিনে আনল ১৫০ টাকায়।

**রামগরুড় সংকলিত**

# আইনে নারীর অধিকারের পরিধি

**অরুণা মুখোপাধ্যায়**

অধুনা শহরে বহু নারীকণ্ঠ উচ্চস্বরে বলে থাকেন, ''এখন আমাদের মেয়েদের যুগ— আমাদের অধিকারও অসীম। বিয়ের আগে সকাল ৯টায় যেমন ঘুম থেকে উঠতাম, বিয়ের পরেও ঠিক সেই অভ্যাসই পালিত হবে। আমার মতো নববধূর দ্বারা এর ব্যতিক্রম ঘটানোর চেষ্টা করার ইঙ্গিত পেলেই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ (ক) ধারার প্রয়োগ ঘটাবো মানসিক অত্যাচারের কারণের ভিত্তিতে, যেটা তারা মুক-বধির হয়ে থাকলেও আইনের অপপ্রয়োগ ঘটানো আমাদের কাছে খুব সহজ।'' ৫০ বছরের দীর্ঘ আইনজীবন কাটিয়ে এক এক সময় মনে হয়েছে আমাদের সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের একি অবস্থা— যেখানে স্নেহ, মায়া, ভালবাসায় ঘেরা নারীজীবনের, সাধিকা জীবনের প্রতিমূর্তি ছিলেন মা-সারদা, গৌরীমাতা সাধু মায়েদের আদর্শ নারীমূর্তি।

আজকের দিনে বহু মেয়েই আদর্শ, কর্তব্য, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে বেপরোয়া চালচলনে অশালীন ভাবভঙ্গিতে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ও আগেকার দিনের মতো যেমন সেই রামও নেই, রাজত্বও নেই— ঠিক তেমনি আদর্শনিষ্ঠ বাবা মায়েদেরও সংখ্যা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। চক্‌লেট, বিস্কুট খাওয়ার আনন্দের মতোই তাদের জিহ্বা সততই লালসাযুক্ত হয়ে আছে ডিভোর্স করার দিকে, মিথ্যা মামলার অপপ্রয়োগে ৪৯৮ (ক) ধারার প্রয়োগের প্রতি ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভরণপোষণের প্রয়োজন না থাকলেও তারা অর্থের লালসায় ছুটে চলেন ভরণপোষণ পাবার উদ্দেশ্যে।

বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো আধুনিক যুগের নারীদের, মায়েদের কল্যাণের জন্য আইনে নারীর অধিকারের পরিধি কতটা পর্যন্ত আইনসম্মত সে বিষয়ে বোধগম্য করা— যাতে তাঁদের কর্তব্যের পরিধি বিস্মৃত না হয়ে যায়। প্রথমেই বলে রাখি, আইনের মূল ও প্রধান কথাই হলো Rights and duties are co-relative terms অর্থাৎ অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতীয় সংবিধানেও নারী ও পুরুষের লিঙ্গবৈষম্য দূর করে সমানাধিকারের কথা স্বীকৃত হয়েছে। সেজন্য নারী ও পুরুষের পারস্পরিক কর্তব্যবোধ ও অধিকারবোধ থাকা প্রয়োজন। নারীপ্রগতির যুগে বহু জনকল্যাণমূলক আইনের দ্বারা নারীর অধিকারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে--- কিন্তু কর্তব্যবোধ

আইনের দরবারে লিখিত না হলেও এটি ন্যায়নীতির প্রস্তরে লিখিত হয়ে আছে, গীতার উক্তিতে আছে বিষয়াসক্ত মন প্রথমে বিষয়রস পান করে, পরিণামে কিন্তু এটি বিষতুল্য হয়। আইনজীবনে দেখেছি বহু মেয়েই নারী স্বাধীনতাকে নারীর স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত করে জীবনপথে বিশৃঙ্খল হয়ে চলে থাকেন। এই যে ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য প্রচেষ্টা এটি যদি কর্তব্যবুদ্ধি সম্মত হোত তাহলে সেই নারীর জীবনে ধ্বংস ডেকে আনতো না। অর্থাৎ বিবাহিত মহিলার উচিত স্বামী যদি অত্যাচারী না হন ও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হন, তাহলে ওই স্বামীর সঙ্গেই বাকি জীবন নীতিগতভাবে কাটানো ও অন্য পুরুষ প্রেমিকের প্রতি ভোগলালসা বিসর্জন দেওয়া। অনেক সময় মেয়েদের বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলাদের তার বৃদ্ধ শ্বশুর ও অসুস্থ বৃদ্ধা শাশুড়ীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্যবাণ প্রয়োগ করতেও দেখেছি। শ্বশুর শাশুড়ী তাঁদের নিজেদের বাড়িতে বাস করা সত্ত্বেও বিবাহিতা বধূ অবজ্ঞাসূচক ভরে বলে ওঠেন— 'বৃদ্ধ বয়সে আর কতদিন বাঁচবেন'। ভাবতে কষ্ট হয় যে কর্তব্যবোধ হারিয়ে বধূরা যদি ভাবেন যে অধিকার তাদের অসীম, তাহলে আইনগত ভাবে আদালতেও কিন্তু এই পুত্রবধূদের পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেহেতু শ্বশুরবাড়িতে পুত্রবধূ বিশেষ যত্ন ও আদর সহকারেই জীবন কাটাতেন। অনেক বধূমাতাকে দেখেছি ভরণপোষণ পাবার আগ্রহে ও লালসায় ছয় মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে শ্বশুরবাড়িতে ফেলে বাপের বাড়িতে দিনের পরদিন বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন। সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার বাবা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা প্রাণ দিয়ে আঁকড়িয়ে মানুষ করে তুলেছেন ও বধূমাতা নিজেই লিখে দিয়ে গেছেন কোনওরকম অশান্তি না থাকা সত্ত্বেও তিনি শিশুর ভার বহন করতে নারাজ এবং সেইসময় একটি অবিবাহিত পুরুষ বন্ধুও তার প্রতি আসক্ত হয় ও সন্তানসহ তাকে বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বধূটিও শিশুর দিকে ফিরে তাকায় না। শিশুটির পিত্রালয় থেকে ভাল বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময়ে শিশুটিকে তার মনের ভাব জানবার জন্য তার বাবা, ঠাকুমা ও ঠাকুর্দা যখন জিজ্ঞাসা করতেন— ''তুই তোর মায়ের কাছে যাবি?'' শিশুটি চোখ বড়বড় করে রাগত ভরে বলতো— ''একদম যাব না। আমার মা তো তুমি'', ঠাকুমাকে দেখিয়ে বলতো। শিশুর ঠাকুমা ঠাকুর্দা ও মা বহু আদর যত্নে শিশুকে আজও বড় করে তুলেছেন। উপরোক্ত ঘটনাগুলো দেখলে মনে হয় নারীর অধিকার আছে ঠিকই, কিন্তু যে অধিকার মানবাধিকারের ন্যায় নীতির কষ্টিপাথরকে উপেক্ষা করে হয় না, অর্থাৎ কর্তব্যবোধহীনতা মায়ের জীবনে ঘটলে যেটিতে অধিকার বোধের ছাপ পরিস্ফুট হয় না ও ন্যায়নীতির বিচারে সেই মানুষটিকে অর্থাৎ তিনি নারীই হোন বা পুরুষই হোন পরাজয় তাকে মেনে নিতেই হবে। আমার মনে হয়, শুধু মাত্র আইনজীবীর দৃষ্টিতে নয়, ঈশ্বরের তুলাদণ্ডে তার যে ন্যায়বিচার হবে সেটিতে তার নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে। সারদা মায়ের উক্তি দিয়ে বর্তমান নিবন্ধটি শেষ করছি, সেটি হলো— ''যদি শান্তি পেতে চাও, কারোর দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। তবেই শান্তি পাবে।'' নারীজাতির আদর্শ হলেন মা সারদা। তাই সারদা মাকে প্রণাম করে নারী জাতির শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য প্রার্থনা করছি।

# নির্বাসিত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এক রক্তজমাট দলিল

**অতিথি কলম**

**রাজেশ সিং**

> **“পণ্ডিতেরা যদি ভেবে থাকেন উপত্যকায় শান্তি ফিরলেই তাঁরা ফিরে আসবে, তবে সেটা হবে খুব অবাস্তব ব্যাপার।” এই মন্তব্যের মধ্যেই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য উপত্যকা এখনও নিরাপদ নয়। এরপরও তিনি চাইছেন পণ্ডিতরা ফিরে আসুক, সেটা কী তবে কচুকাটা হবার জন্য?**

আশির দশকের শেষ ও নব্বইয়ের দশকের প্রথম লগ্নে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাধ্য করা হয়েছিল কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে যেতে। নিজের দেশেরই ভিতর নির্বাসনের সেই রক্তজমাট আখ্যান উঠে এসেছে রাহুল পণ্ডিতের ‘আওয়ার মুন হ্যাজ ব্লাডক্লট’ গ্রন্থে। এ তাঁর নিজের এবং নিজেদের নির্বাসনের উপাখ্যান।

এই বই এই সত্যটুকু জানিয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরি মুসলমানরা বিপুল সংখ্যক কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাধ্য করেছে কাশ্মীর ছেড়ে যেতে। বইটি কিন্তু লেখা হয়নি রাজনৈতিক এ্যাজেন্ডা হিসাবে। লেয়া হয়নি কোনও কৌশলী পরিকল্পনায়। শুধু দেখানো হয়েছে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের চোখের সামনেই তাদের ভুবন হারানোর সত্য ঘটনা। রাহুল পণ্ডিত নিজেই এই ঘটনার শিকার, কারণ তিনি ও তাঁর পরিবার সেই কয়েক লক্ষ নির্বাসিত পণ্ডিতদেরই একজন যাদের বাধ্য করা হয়েছে তাদের ভূমি ও শান্তির জীবনকে ছেড়ে যেতে। কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নবাদীরা উপত্যকারই এক শ্রেণীর মুসলিমদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন নিয়ে ভয়, অরাজকতা হত্যা চালিয়ে বিতাড়িত করেছে পণ্ডিতদের, যারা তাদেরই মতো কাশ্মীরের ভূমিপুত্র। লেখক তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে উপত্যকায় নৈরাজ্য ও হিংস্রতা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাছে। এর সূত্রপাত নব্বইয়ের দশকে। যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী সমর্থকরা দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তায় মিছিল শুরু করে। দাবি তোলে আজাদ কাশ্মীরের। উচ্চারিত হয় ‘হামকো কেয়া চাহিয়ে? আজাদী। তাদের লক্ষ্য বস্তু হয়ে ওঠে নিরীহ কাশ্মীরের পণ্ডিতরা। সেই বিশৃঙ্খলাকেও সমর্থন জানায় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা। এই অসহনীয় পরিস্থিতিকে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে কাশ্মীরের পণ্ডিতেরা, ছত্রে ছত্রে যার উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থে।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সংগঠনের অন্যতম মুখ এইচ. এন. জাট্টু এক খোলা চিঠিতে— জে. কে. এল. এফকে জানাতে বলে যে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করুক তারা। জে. কে. এল. এফ এটাকে সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করে ও প্রতিক্রিয়া দেয় তার পর দিনই। ট্যাঙ্গিপুরাতে জাট্টুর এক সহযোগীকে হুমকি দেয় তারা। তাদের মধ্যে দু’জন তাকে ধরে। একজন গুলি করে তাঁর হাঁটুতে। রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পর তিনজনে তাকে লাথি মারতে মারতে নর্দমায় ফেলে দেয়। একজন তাঁর শরীরে প্রস্রাব করে। যন্ত্রণায় কাতরানোর সময় তাঁর উপর গুলি করা হয়। এবং শেষ পর্যন্ত জাট্টুর সহযোগী মারা যায়। এই ছিল এইচ. এন. জাট্টুর খোলা চিঠির প্রতিক্রিয়া জে. কে. এল. এফের তরফ থেকে।

এ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রতি ঘৃণা ও মধ্যযুগীয় ব্যবহারের বহু নিদর্শন এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। পণ্ডিতদের প্রতি ঘৃণা কি মুছে গেছে? এমনকী কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি যে কাশ্মীরের পণ্ডিতদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, সেই চেষ্টার মধ্যে কি ছিল পণ্ডিতরা ফিরে এলে নিরাপত্তার দেওয়ার আশ্বাস? লেখক তাঁর গ্রন্থে স্রষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, না।

জম্মু কাশ্মীরের সরকার ব্যর্থ হয়েছে সেখানকার নির্বাচিত সরপঞ্চদের রক্ষা করতে। সেই সঙ্গে ব্যর্থ হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাজকর্ম এবং উপত্যকা ও সীমান্তপারের তাদের নিয়ন্ত্রকদের নিয়ন্ত্রণ করতে। এই সরকার একদল তরুণকেই রক্ষা করতে পারেনি যারা গান গাইতে চেয়েছিল, সেখানে কী নিরাপত্তা আছে ফিরে যাওয়া পণ্ডিতদের? যেখানে পুরোমাত্রায় সম্ভাবনা রয়ে গেছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আক্রমণের নিশানা হবার।

সমর্থকেরা আবেদন করেছে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকায় ফিরে আসার জন্য। সেগুলিকে নিশ্চয় বিচার করে দেখা উচিত। কিছুদিন আগে চণ্ডীগড়ের এক অনুষ্ঠানে হুরিয়তি নেতা মীরওয়াইজ উমর ফারুখ বলেন— “কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা আমাদেরই সমাজের অংশ। আমরা চাই তাঁরা ফিরে আসুক।” বিভিন্ন সময়ে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফিরে আসার ব্যাপারে তিনি অপরিণত মন্তব্য করেছেন, যেমন “পণ্ডিতেরা যদি ভেবে থাকেন উপত্যকায় শান্তি ফিরলেই তাঁরা ফিরে আসবে, তবে সেটা হবে খুব অবাস্তব ব্যাপার।” এই মন্তব্যের মধ্যেই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য উপত্যকা এখনও নিরাপদ নয়। এরপরও তিনি চাইছেন পণ্ডিতরা ফিরে আসুক, সেটা কী তবে কচুকাটা হবার জন্য?

আরও এক বিষ ছড়ানো চরমপন্থী হুরিয়তি নেতা সৈয়দ আলি সাহ গিলানির অবস্থান আরও ভণ্ডামিপূর্ণ। কুড়িবছর আগে পণ্ডিতেরা যখন অত্যাচারিত হচ্ছিল তখন তিনি নীরব দর্শক ছিলেন। আর এখন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফেরা নিয়ে শর্ত চাপাচ্ছেন। ২০১২-র জুলাইয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, ''কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফেরার বিষয়ে তিনি বিরোধী নন, কিন্তু তাদের জন্য উপত্যকায় আলাদা অঞ্চল গঠনের বিরোধী। কাশ্মীরিদের ধর্মীয়ভাবে পৃথক করার এটা একটা চেষ্টা, যা আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।'' কিন্তু বাস্তব সত্য এটা যে, যে কোনও কাশ্মীরি পণ্ডিত বলবে, তাদের মুছে দেওয়ার বা তাড়িয়ে দেওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটা পরিকল্পনা, যাতে তারা উপত্যকাকে ভারত থেকে আলাদা করে দিতে পারে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে হুরিয়তি নেতাদের কোনও নৈতিক অধিকার নেই কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকায় আলাদা অঞ্চল চাওয়ার দাবির বিরুদ্ধে কিছু বলা।

কিছু ব্যক্তি ও অ্যাকেডেমিসিয়ানরা দাবি করছেন উপত্যকা থেকে নির্বাসিত পণ্ডিতদের সংখ্যা যতটা বলা হচ্ছে ততটা নয়। এই গ্রন্থে নির্বাসনের সেই মর্মন্তুদ ঘটনা দেখিয়ে সেই দাবির অসারতার প্রমাণ দিয়েছেন। লেখক বলেছেন ১৯৯০ এর জানুয়ারি থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা উপত্যকা ছাড়তে শুরু করে। সংখ্যায় যেটা ও ৫০,০০০-র মতো। উদ্বাস্তু হয়ে তাঁরা আশ্রয় নেয় জম্মুর বিভিন্ন শিবিরে ও আরও অন্যান্য স্থানে। কেবলমাত্র পরে কিছু সংখ্যক ফিরে যায়। লেখক বলেছেন, পণ্ডিতদের আশ্রয়চ্যুত হওয়ার দায় বর্তায় উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদেরই উপর। তাদের আন্দোলন হিংসার সমার্থক। এবং পণ্ডিতদের চলে যাওয়া রুখতে তারা কোনও উদ্যোগই নেয়নি।

১৯৯৭ এর মার্চে সন্ত্রাসবাদীরা ঘরের ভিতর থেকে বার করে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করে। ১৯৯৮ এর জানুয়ারীতে ২৩ জন কাশ্মীরি পণ্ডিত যাদের মধ্যে নারী ও শিশুরা ছিল তাদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। ২০০৩-এর মার্চে দুইজনকে হত্যা করা হয়।

হিংসার এই চক্রাবর্তে বিচ্ছিন্নতাকামীদের সমবেদনা মাখানো ডাক 'কাশ্মীরি পণ্ডিত ভাইবোনেরা ফিরে আসুক' বলা এক ধরনের ফাঁকা বুলি ও অর্থহীন। তারা শুধু দেখুক যারা ফিরেছে তাদের নিরাপত্তা দেখা ও আর কোনও ক্ষতি না হওয়ার সম্ভাবনা রোখা। বিচ্ছিন্নতাকামীদের এই বাগড়াম্বর রাহুল পণ্ডিতকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তিনি বলেছেন, 'তাঁকে আরও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে উপত্যকায় যে মুষ্টিমেয় কাশ্মীরি পণ্ডিতরা এখনও রয়ে গেছে তাদের কথা কেউ ভাবছে না দেখে।'

এই সময়ে উপত্যকায় উঠে এসেছে নতুন এক বিতর্ক। উপত্যকা থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের যাওয়াটা কী স্বেচ্ছায় যাওয়া না তাদের বাধ্য করানো হয়েছে। আর বিতর্ক, কতজন কাশ্মীরি পণ্ডিত হিংসায় সত্যি করে মারা গেছে। সংখ্যা ৬৫০ না ৩০০০ তা নিয়েও। কোনটা বেশি প্রভাব ফেলেছে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের, সন্ত্রাসবাদীদের হিংসাশ্রয়ী কাজ না বিচ্ছিন্নতাকামীদের অন্যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

এই সব বিতর্কে বলা যাচ্ছে না আসল সত্যিটা। কিন্তু সত্য কোনও কিছুকে বদলাতে পারবে না। এটা বাস্তব সত্য, কাশ্মীরি পণ্ডিতরা মারা গেছে, গৃহচ্যুত হয়েছে তাদের দ্বারা যাদেরকে তাঁরা আপন ভাবত। এখনও তাদের বহু ঘাতক ও তাদের নিয়ন্ত্রকেরা উপত্যকায় বহু সংখ্যায় রয়েছে। যা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকায় ফেরার ব্যাপারে বাধাস্বরূপ।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া   প্রত্যুষ মণ্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমনসূচী-২০১৩

| ভ্রমণ | দিন | শুভ যাত্রা | প্যাকেজ মূল্য | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাপ্তবয়স্ক | বালক/বালিকা ৫-১১ বৎসর | শিশু ২-৪ বৎসর |
| উত্তর ভারত (দেরাদুন-মুসৌরী-হরিদ্বার-দিল্লি-মথুরা-বৃন্দাবন-আগ্রা) | ১২ | ১৫ই মার্চ,২০১৩ | ৯,৮০০/- | ৭,৫০০/- | ২,৫০০/- |
| কাশ্মীর (অমৃতসর ও বৈষ্ণোদেবী সহ) | ১২ | ২৮শে মার্চ,২০১৩ | ৯,৮০০/- | ৭,৫০০/- | ২,৫০০/- |
| গ্যাংটক-নামচি-পেলিং | ৮ | ১৭ই এপ্রিল,২০১৩ ২২শে মে,২০১৩ | ৭,০০০/- | ৫,৫০০/- | ২,০০০/- |
| দার্জিলিং-গ্যাংটক | ৮ | ২৩শে মে,২০১৩ | ৬,৮০০/- | ৫,১০০/- | ১,৭০০/- |
| সিমলা-কুলু-মানালী | ১১ | ৯ই মে,২০১৩ | ৯,৫০০/- | ৭,৩০০/- | ২,৪০০/- |

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর চার মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

**প্যাকেজে থাকছে :-** ট্রেন/লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স, গাড়ী পার্কিং।

**প্যাকেজে থাকছে না :-** এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

## রেল বাজেট ২০১৩-১৪

# পবন-হাওয়া এবার ঘুরল রায়বেরিলিতে

**তারক সাহা**

পর পর দুদিন হাওড়া থেকে ১৩০৩৯ আপ দিল্লি-জনতা এক্সপ্রেস বাতিল। সংকেত কি রেল এবার আম-আদমি-র ট্রেন তুলে দেবে? এমন-ই সেদিন মনে হলো। রেলের ভাঁড়ার নাকি শূন্য। একেবারে ফুটো কলসি। আর শূন্য কলসি ভরতে পবনজী (পবন বনসল, রেলমন্ত্রী) দেদার এসি গাড়ির পত্তন করলেন। রেলের বাজেট দেখে যেটা মনে হলো যে, পবনজী আম-আদমিকে বাধ্য করবেন এসি গাড়িতে চড়তে। কারণ যেসব গাড়ি এবার নতুন করে তার প্রবর্তন হলো তার সবগুলিই প্রায় বাতানুকূল। বাংলা থেকে যে নয়টি গাড়ির পত্তন হলো নতুন করে তিনটি গাড়ি-ই সম্পূর্ণ এসি।

কিছুদিন আগেই শহরতলির ট্রেনের ভাড়া বেড়েছে। তাই এবারের পবনের গরম হাওয়ার আঁচ থেকে রেহাই আপাতত নিত্যযাত্রীদের। একে মূল্যবৃদ্ধির চাপে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা। খাদ্যশস্য, ডাল, কয়লা, লোহা-ইস্পাত, সিমেন্ট, উচ্চ গতিসম্পন্ন ডিজেল, কেরোসিন, এল পি জি, আকরিক লোহা, ইউরিয়া ইত্যাদি পণ্যের মাশুল বাড়ছে ৫.৮ শতাংশ হারে। এমনিতেই চাহিদার গতি নিম্নগামী, তাই বুনিয়াদী শিল্পের কাঁচামাল যেমন কয়লা, লোহা-ইস্পাত, আকরিক লোহা প্রভৃতি পণ্যের দর বৃদ্ধি দেশের অর্থব্যবস্থাকে অবশ্যই নিম্নমুখী করবে।

আমাদের দেশের আম নেতাদের মধ্যে যাঁরা রেলমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাদেশিকতাকে প্রচণ্ডভাবে উসকে দিয়েছেন। বারে বারে মনে হয়েছে ভারতীয় রেল কি কেবল কর্ণাটকের, বা বিহারের নাকি পশ্চিমবঙ্গের। তাই পবন বনশলই বা কম যাবেন কেন। দীর্ঘ সতের বছর অপেক্ষার পর এবার রেল কংগ্রেসের হস্তগত। এই সুবাদে দু'হাত ভরে বরাদ্দ হয়েছে রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানার আর সব থেকে বড় খবর ভারতীয় রেলের মানচিত্রে বড় জায়গা করে নিয়েছে রায়বেরিলি। নিন্দুকেরা একে পক্ষপাত দুষ্ট বললেও এটাই আজকের রাজনীতির বড় দস্তুর। পবনজীর নিয়োগকর্ত্রী সোনিয়াজীকে না দেখলে চলবে কী করে। সামনে নির্বাচন তাই ম্যাডামের নির্বাচনী ক্ষেত্র রায়বেরিলিতে একটি কোচ কারখানা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় ইস্পাত নিগমের সঙ্গে মিলেজুলে একটি চাকা তৈরির কারখানা গড়ার প্রস্তাব করেছেন পবনজী।

এবারের বাজেটে সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছেন মমতা। রেল এমন এক দপ্তর যার দ্বারা চটজলদি জনপ্রিয় হওয়া যায়। মমতা মনমোহন সরকারে থেকে সেই কাজটা করে এসেছেন ভাড়া না বাড়িয়ে, পণ্য মাশুল না বাড়িয়ে, আর রাজ্যের জন্য যথেচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করে, নতুন নতুন ট্রেন প্রবর্তন করে। দুর্বল মনমোহন সরকার যাতে বিপাকে না পড়ে তার চেষ্টায় মমতাকে দু' বাহু তুলে সাহায্য করেছেন। এবারে যা হবার তা হয়েছে। দীনেশ দ্বিবেদীকে ন্যক্কারজনকভাবে সরিয়ে দিলেন কেবল নিজেদের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে। এবার তো সেই ভাড়া বাড়লই, তাহলে মমতার কর্তৃত্বটা রইল কই! সেই সঙ্গে মমতার প্রকল্পের বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রে হয় কমিয়েছেন না হলে বাতিল করেছেন (সারণী দ্রষ্টব্য)।

২০১৪ সাল নির্বাচনী বৎসর। আর তাই দেশের রেলের পবন একটু বেশী উত্তরমুখী। অর্থাৎ এবারে পবনজী দরাজ হাতে বরাদ্দ বেশি করেছেন সেই সব রাজ্যে যেসব রাজ্যে কংগ্রেস শক্তিশালী। কিন্তু রেল বাজেটের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে যা রেখে গেছেন তাঁর পূর্বসূরীরা। সুতরাং এতে দোষের কিছু নেই, যতই বিরোধীরা হৈ চৈ করে সংসদ মাথায় তুলুন।

এবারের রেল বাজেট তৎকাল সংরক্ষণে টিকিট পিছু ১০০ টাকা বাড়িয়েছেন পবনজী। প্রশ্ন উঠছে সাধারণ আসন সংরক্ষণের আসন সংখ্যা কমিয়ে তৎকাল সংরক্ষণের আসন সংখ্যা বেড়ে যাবে না তো অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে? ঘুরপথে রাজস্ব আদায়ের এই উপায়ে সরকার বেশি নিন্দিত হবে না তো?

ভাল-মন্দ নিয়ে যেমন মানুষ, তেমনই ভাল-মন্দ নিয়ে এবারের রেল বাজেট। এবারের বাজেটের ভালদিক হলো পরের জংশনের জন্য অপেক্ষা না করে ফোন করলেই চলন্ত ট্রেনে মিলবে পরিষেবা। অতিরিক্ত আরাম পেতে হলে পয়সা ফেললেই আরাম পৌঁছে দেবেন পবনজী। দূষণ বড় বালাই। তাই প্লাস্টিক এবার থেকে রেলে অনুপস্থিত। নীরের জলের কারখানা (অতিরিক্ত) বিজয়ওয়াড়া, নাগপুর, ললিতপুর, বিলাসপুর আর মোদীর

| সারণী | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বাংলার হাল | | | | |
| মেট্রোরেল | | | | |
| প্রকল্প | ২০১২-১৩ | এখন পর্যন্ত খরচ | ২০১৩-১৪ | আরও চাই |
| নোয়াপাড়া-বারাসত | ১০৫০ | ৬০.৩৬ | ১৭০ | ২১৬৪.৩৬ |
| বিমানবন্দর-নিউ গড়িয়া | ১০৫০ | ২১৬.৬৬ | ২৫০ | ৩৪৮৫.৩২ |
| দমদম-টালিগঞ্জ | ৬০০ | ৩২৩৪ | ৩০ | ১৩৯.৪৯ |
| জোকা-বিবাদী বাগ | ৭৫০ | ২৫১.৬২ | ৪৫ | ২৩২২.৪০ |
| ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডর | — | — | ১০০ | ৪৭৭৪.৫৮ |
| | কারখানা | | | |
| কাঁচরাপাড়া | ১০০ | ১৮.৬৫ | ১.৯৪ | ৭৩৯.৫৭ |
| ডানকুনি | ২২ | ৬০.১৯ | ১৯ | ১৮৬.৭৬ |
| শ্যামনগর | বাজেটে প্রস্তাব | ১ | ১ | ৭৮.২৬ |
| হলদিয়া ডেমু কারখানা | বাজেটে প্রস্তাব | ১০ | ১ | ১৬৭.৪৬ |
| | লাইন ও প্রকল্প | | | |
| লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা-চন্দননগর | ৩০ | ১৬০.৭০ | ৫ | ৩৮১ |
| তমলুক-দীঘা, দেশপ্রাণ-নন্দীগ্রাম | ২৫ | ৪২১ | ১৫ | ৬৩৯ |
| বাদুতলা-ঝাড়গ্রাম | ১ | ১ | ১ | ২৮৭ |
| নলহাটি-সাগরদিঘি ডাবলিং | বাজেটে প্রস্তাব | ১৩.৬৪ | ২৪ | ৯৪.৩৭ |
| হাওড়া শম্ভুমিত্র সংস্কৃতি কেন্দ্র | বাজেটে প্রস্তাব | ০.৫০ | ০ | ২৯.৭৮ |

*(সব কোটি টাকার অঙ্কে) সৌজন্যে : আনন্দবাজার পত্রিকা*

আমেদাবাদে।

ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি, ট্রেনের যাত্রাপথ বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটনা, ঘোষণার মধ্যে নতুন কিছু নেই। পবনজী এবার একটু সংস্কারমুখী। তাই আলুওয়ালিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ব-কলমে ভাড়া বাড়ানোর একটা পথ খুলে রাখলেন পাঁচ সদস্যের এক কমিটি গড়ার প্রস্তাব করে।

যেহেতু কমিটির সদস্যরা সরকারি পোষ্য, তাই এঁদের সুপারিশ অবশ্যই যাত্রী যন্ত্রণা বাড়াবে বই কমাবে না। এক ঢিলে দুই পাখি মারার প্রস্তাব— ভাড়াও বাড়বে অথচ সরকারের ঘাড়ে দোষ আসবে না।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

# অপহৃতা ছাত্রীর উদ্ধারের দাবীতে মালদার কালিয়াচক থানা ঘেরাও

**তরুণ কুমার পণ্ডিত॥** গত তিন মাস ধরে অপহৃতা এক নাবালিকা ছাত্রীর উদ্ধারের দাবিতে ৩ মার্চ মালদা জেলার কালিয়াচক থানা ঘেরাও এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের শ' চারেক সদস্য। পায়েল মণ্ডল নামে দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে গত ২৭ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে (বাড়ি-সুজাপুর হিন্দুপাড়া) তার মামার বাড়ি সামসেরগঞ্জ থানার মহেশটোলা থেকে অপহরণ করে সুজাপুরের বসনিটোলার ওসমান গনি। তারপর কালিয়াচক ও সামসেরগঞ্জ থানা, মালদা ও মুর্শিদাবাদের দুই এস পি ও উচ্চ আদালতে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। সি আই ডি-র ভবানীভবনেও (কলকাতা থেকে সংবাদপত্রে ছবিও প্রকাশিত হয়েছে) অভিযোগ জানানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসন ওসমান গনির বাবা আসরাফুল শেখকে গ্রেপ্তার করেনি বা

*থানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ।*

ছাত্রীটিকেও উদ্ধার করেনি। কালিয়াচক থানার আই সি এবং তদন্তকারী অফিসার সাইমন টুডু (নেপালীবাবু), মেয়েটি কোথায় আছে সব জানেন বলে অভিযোগ। কিন্তু স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ হলো--- সুজাপুরের কুখ্যাত তৃণমূল নেতা সহরুল হকের প্রচ্ছন্ন মদতে এবং মোটা টাকার জন্য পায়েল মণ্ডলকে পুলিশ উদ্ধার করছে না, অথচ সামনে ২৫ মার্চ থেকে ছাত্রী পায়েল মণ্ডল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। পুলিশ প্রশাসনের উদাসীনতার প্রতিবাদে কালিয়াচক থানাতে ডি এস পি সিদ্ধার্থ দরজির সামনে আই সি স্বীকার করেন তদন্তকারী অফিসার সাইমন টুডুর জন্য তদন্ত করা যায়নি। অপহরণ কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এক দুষ্কৃতি এরশাদ মোমিনকে পুলিশ চাপে পড়ে গ্রেপ্তার করলেও তাকে পুলিশ হেফাজতে না রেখে এবং জিজ্ঞাসাবাদ না করেই জেলে রেখেছে। এমত অবস্থায় আগামী তিন দিনের মধ্যে অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানানো হলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। অপরদিকে কালিয়াচকের বিজেপি নেতা নন্দন ঘোষ অবিলম্বে দোষীকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই,

WANTED DISTRIBUTOR

ময়লার চরম শত্রু কাপড়ের পরম বন্ধু

গ্লোবাল ফাইটার

ডিটারজেন্ট পাউডার

প্রতিনিধিবিহীন এলাকায়
ডিস্ট্রিবিউটরের জন্য

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

মোবাইল নং-০৩৩-৩২৬১০৩৪৫,
৯৬৮১৬০০৯৭৫

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য
প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

# জন্মেজয়-বৈশম্পায়ন সংবাদ

# অথ বিষয় ধর্মঘট

**কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী**

জন্মেজয় বৈশম্পায়নকে প্রশ্ন করলেন, হে মহর্ষি, আমি শ্রবণ করেছি কলি যুগে ধর্মঘট নামে একটি শব্দ শোনা যাবে। এটি এক শ্রেণীর মানুষকে খুশি করবে আবার এক শ্রেণীর মানুষকে নাকি অসন্তুষ্ট করবে।

বৈশম্পায়ন বললেন, হে কুরুকুলপতি, তুমি সঠিক বিষয় আমার কাছে জানতে চেয়েছ। আমি এ বিষয়ে তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করছি। কলিযুগে প্রতিটি দেশে অজস্র রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হবে। এই দলগুলির মধ্যে যে দল ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে সেই দলই সরকার গঠন করবে। বিরোধী দলগুলি সর্বদা চেষ্টা করবে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে। এবং এটি করার জন্যে তারা সরকারকে সব সময় নানাভাবে চাপে রাখবে। ধর্মঘট হবে চাপে রাখার অন্যতম অস্ত্র।

জন্মেজয় অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, হে, ত্রিকালজ্ঞ মুনিবর, ধর্মঘট কীভাবে চাপে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে দয়া করে এটি আমাকে জানান।

বৈশম্পায়ন বললেন, মহারাজ, আমি আপনাকে সবিশদ জানাব, আপনি অধীর হবেন না। বিরোধীদলগুলি সরকারের প্রতি অনাস্থা জানাবার জন্যে একটি নির্দিষ্ট দিন কলকারখানা বন্ধ করার ডাক দেবে। ওই দিন তারা জনগণকে কাজে যোগ দিতে নিষেধ করবে।

জন্মেজয় উত্তেজনায় চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, জনগণ কি তাদের কথায় রাজী হয়ে যাবে?

**মহারাজ, ধর্মঘট একটি জাতির দর্পণ। যে জাতি যত আদর্শভ্রষ্ট— যারা দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায় না— যাদের কাছে দেশ বড় নয় দল বড় তারাই ধর্মঘট করে।**

বৈশম্পায়ন বললেন, মহারাজ, জনগণ কোনওমতেই ধর্মঘট চাইবে না। বিশেষত যারা দিন মজুর তারা ধর্মঘটের বিরোধিতা করবে, কেননা একদিন কাজ করতে না পারলে তারা দৈনিক যে মজুরি পায় তা থেকে বঞ্চিত হবে, এমনিতে তারা যে মজুরি পায় তা দিয়ে তাদের সংসার চলে না।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসা করলেন, মুনিবর, যদি তারা না চায় তাহলে কীভাবে ধর্মঘট করা সম্ভব হবে?

বৈশম্পায়ন হেসে বললেন, মহারাজ, যে কোনও রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ খুব অসহায়। তারা যন্ত্রবৎ। তাদের যেমন চালাবে তারা তেমনি চলতে বাধ্য হবে। এই শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিতে না চাইলে ধর্মঘটকারী দলের সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবকেরা যাদের ক্যাডার বলা হবে তারা এই শ্রমিকদের ভয় দেখাবে। তখন বা ধর্মঘটের পরে তাদের উপর নিরন্তর অত্যাচার করবে, তাদের দিন যাপন করা অসম্ভব করে তুলবে। তাই তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মঘটে সামিল হবে।

জন্মেজয় বললেন মুনিবর, এই পরিস্থিতে সরকারের ভূমিকা কী হবে?

বৈশম্পায়ন বললেন, মহারাজ, যখন বিরোধীদল ধর্মঘট ঘোষণা করবে তখন সরকার ধর্মঘটের বিরোধিতা করবে, বিরোধীদলের নেতাদের অনুরোধ করবে যাতে ধর্মঘট করা থেকে বিরত হয়। বিরোধীদলের নেতারা স্বভাবতই সরকারের অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে। তখন সরকার ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার হুমকি দেবে, প্রধানত, তাদের বেতন কেটে নেবার ভয় দেখাবে। কিন্তু বিরোধীদলের নেতারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে। ধর্মঘটের দিন দেশে প্রচণ্ড উত্তেজনা হয়। সরকার জোর করে গাড়ি চালালে ক্যাডাররা বাধা দেয়, গাড়ির উপর ঢিল তো ছোড়েই, সেই সঙ্গে ছোঁড়ে বোমা। বহু লোক আহত ও নিহত হয় এবং সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসা করলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ, এই ধর্মঘট কি বন্ধ করা যায় না?

বৈশম্পায়ন হেসে বললেন, ধর্মঘট হলো সমস্ত দলের নেতাদের শক্তি প্রদর্শনের অস্ত্র। কোনও দলই চায় না ধর্মঘট বন্ধ হোক। মজার কথা হলো, সরকার পক্ষ ক্ষমতায় আসার পরে ধর্মঘটের বিরোধিতা করে। অথচ

তারা ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত ধর্মঘট করে এসেছে। একটি মজার বিষয় হলো কোনো কারণে যদি ধর্মঘট সফল না হয় তাহলেও বিরোধীদলের নেতারা তারস্বরে বলবে ধর্মঘট সফল হয়েছে। আর যদি ধর্মঘট সফল হয় তাহলে সরকার জানাবে ধর্মঘট ব্যর্থ।

জন্মেজয় বললেন, এ তো ভারি মজার ব্যাপার। সরকার বলবে ধর্মঘট ব্যর্থ আর বিরোধীরা বলবে ধর্মঘট সফল। তাহলে লাভ কার হলো?

মহারাজ, এই ধর্মঘটে বিরোধীদের মোটামুটি লাভ হয়। তাদের ডাকা ধর্মঘট ব্যর্থ হলেও তারা যে বেঁচে আছে এটা জানিয়ে দেওয়া হয়। সত্যিকারের ক্ষতি হয় দেশের মানুষের— তাদের একদিনের রুজি রোজগার বন্ধ হয়। আর সেই সঙ্গে দেশের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয় একদিন উৎপাদন বন্ধ হওয়ার কারণে। মহারাজ, ধর্মঘট একটি জাতির দর্পণ। যে জাতি যত আদর্শভ্রষ্ট— যারা দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায় না— যাদের কাছে দেশ বড় নয় দল বড় তারাই ধর্মঘট করে।

জন্মেজয় বললেন, ঋষিবর, সরকারের অন্যায় কাজ ও নীতির বিরোধিতা করার জন্যে ধর্মঘটের কোনও ভূমিকা নেই?

বৈশম্পায়ন বললেন, মহারাজ, সরকারের অন্যায় কাজ ও নীতির বিরোধিতা করার উপায় হলো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। নিরন্তর আন্দোলন করলে সরকার বিরোধীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হয় এবং সব বা কিছু দাবী মেনে নেয়। কিন্তু একদিন ধর্মঘট ডেকে সরকারকে দাবানো যায় না। ধর্মঘট হলো একদিনের চমক। বিরোধীরা এই চমক চায়। আসলে বিরোধী নেতারা হলো সুখের পায়রা। নিরন্তর আন্দোলন করার মতো ধৈর্য বা উৎসাহ তাদের নেই। সরকারকে ধাক্কা দেওয়ার চেয়ে নিজের দলকে একটু চাঙ্গা করতে চাওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য নিজেদের ম্লান হয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা।

জন্মেজয় শুধালেন, মহারাজ, আপনার হিসেবে পৃথিবীর কোন দেশে ধর্মঘট বেশি পরিমাণে ঘটবে?

বৈশম্পায়ন ম্লান হাসি হেসে বললেন, তুমি কি অনুমান করতে পার না? সামান্য একটু চিন্তা করলেই দেখবে আমাদের এই ভারতই হবে ধর্মঘটের লীলাভূমি। তোমাকে আগেই বলেছি— যে দেশের মানুষ যত আদর্শহীন হবে সে দেশের মানুষ তত ধর্মঘট করবে। ভবিষ্যতের ভারত হারাবে আদর্শ, হারাবে ন্যায় বোধ, পঙ্কে হবে নিমজ্জিত। নর্দমায় যেমন কীট থাকে, শ্মশানে যেমন শৃগাল থাকে, অন্ধকারে যেমন বাদুড় থাকে তেমনি ভবিষ্যতের পতিত ভারতকে আশ্রয় করে থাকবে ঘর্মঘট।

জন্মেজয়ের মুখমণ্ডল বিষাদে ভরে গেল। তিনি মাথা নীচু করে বসে রইলেন।


জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
পড়ুন ও পড়ান
স্বস্তিকা
প্রতি সংখ্যা মূল্য ৭.০০ টাকা
বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা

নেত্রদান মহাদান

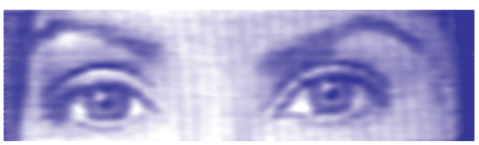



EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা

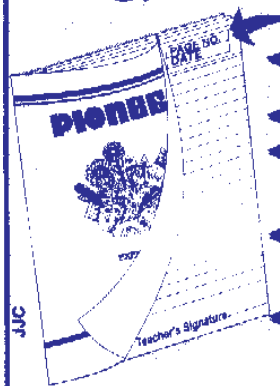




প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

# আধ্যাত্মিক সংগ্রহশালা

অন্য রকম

**বিরাজ রায়॥** পুণের একটি দোতলা বাড়ি, তার দুটি ঘর নিয়েই তৈরি হয়েছে ‘সন্ত বাস্তু সংগ্রহালয়’। যোগী মহাপুরুষ ও দেশের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মানুষদের ব্যবহার্য নানা সামগ্রীতে পরিপূর্ণ সংগ্রহালয়টি। প্রায় সত্তরজন আধ্যাত্মিক গুরুর দেড়শো সামগ্রী আছে এখানে। ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়বে সারা দেওয়াল জুড়ে আধ্যাত্মিক জগতের মনীষীদের ছবি। এবং কাচের আলমারিতে সাজানো তাদেরই ব্যবহার্য জিনিসগুলি। প্রত্যেক আলমারিতে লেবেল সাটানো আছে, যাতে দেওয়া আছে সামগ্রীর পরিচয়। সংগ্রহালয়টি দেখার জন্য দর্শনার্থীদের কোনও প্রবেশ মূল্য দিতে হয় না। সংগ্রহালয়ের তত্ত্বাবধায়ক জানিয়েছেন, প্রতি সপ্তাহে প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো দর্শনার্থী এখানে আসেন।

*পুণায় সন্ত বাস্তু সংগ্রহালয়।*

সুন্দর সুসজ্জিত সংগ্রহালয়টির প্রত্যেকটি জিনিস সযত্নে রক্ষিত আছে, যদিও বেঁচে নেই এর প্রতিষ্ঠাতা ডিডি রেগ। বর্তমানে তাঁর মেয়ে শিবদুর্গা অনিল মারাঠে গোটা সংগ্রহালয়টির দেখাশোনা করেন। তিনি জানিয়েছেন— ‘১৯৯০ সাল নাগাদ আলান্দিতে এটি প্রথম তৈরি হয়, পরে আমরা ২০০৪ সালে পুণেতে চলে আসি। তখন থেকে সংগ্রহালয়টি এই বাড়িতেই আছে।’

বিরল কোনও জিনিসের সংগ্রহ রাখা বা তার মিউজিয়াম করা অনেকেরই শখ আছে। তবে আধ্যাত্মিক মানুষদের বিভিন্ন সামগ্রীর সংগ্রহালয় তৈরি— এটা একটু আলাদা। সংগ্রহালয়ের নির্মাতা রেগের এই পরিকল্পনার সূত্রপাতটাও অদ্ভুতভাবে। ১৯২৭ সাল, তখন রেগের বয়স মাত্র ১৬ বছর। রত্নগিরির এক সন্ত নারায়ণ মহারাজ, তাঁর ধর্মসভায় সে গিয়েছিল। সেখানেই এক হাজার লোকের সামনে সন্ত মহারাজ রেগের ভবিষ্যদ্বাণী করেন— সে একজন ভালো চিত্রকর হবে। সেদিনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ছিল। পরবর্তীতে রেগ একজন চিত্রকরই হয়। তারপর ১৯৬৪ সালে কেদগাও নামে একটি গ্রামে তিনি ছবি আঁকার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে যান। সেখানকার নারায়ণ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত মন্দির ট্রাস্ট তাকে দিয়ে নারায়ণ মহারাজেরই একটি ছবি আঁকিয়ে নেয়। ছবি আঁকা পেশা হলেও রেগ সেদিন তাদের কাছ থেকে কোনও পারিশ্রমিক নেননি। তার বদলে চান নারায়ণ মহারাজের কোনও স্মৃতি চিহ্ন। তখন মন্দির কর্তৃপক্ষ তাঁকে মহারাজের একটি টুপি ও জ্যাকেট দেয়। এখান থেকেই শুরু। তারপর রেগের একটি অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় গুরুদের বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করা।

১৯৬৪ থেকে ১৯৯৯ এই দীর্ঘ সময় তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন। খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করেছেন এই ধরনের নানা জিনিস। কারও চরণ পাদুকা, কারও শাল বা বসার আসন। তার সংগ্রহে আছে পণ্ডিত শ্রীধরস্বামী মহারাজের (১৮৩০-১৮৯৫) গায়ে দেওয়া চাদর ও মাটির তৈরি জলের পাত্র। শ্রীপান্ত মহারাজের একটি ধর্মগ্রন্থ যেটা তিনি রোজ পাঠ করতেন। একশো বছরের পুরানো এক জোড়া জুতো যেগুলো শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীজী ব্যবহার করতেন। এছাড়াও দুজনের ব্যবহার্য দুটি লাঠি, এমনকি সত্য সাঁইবাবার নিজের হাতের সইও রয়েছে।

এইসব বিরল এবং দুর্মূল্য জিনিস সংগ্রহ মোটেই সহজ কাজ ছিল না। অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। ১৯৮২ সালে জংলীবাবা মহারাজকে নিয়ে একটি জীবনীও লেখেন। নাম দিয়েছেন ‘শ্রী সদ্‌গুরু জংলী মহারাজ’। এরজন্য তাকে বারো বছর গবেষণা করতে হয়েছে। এগুলো ছাড়াও সন্ত-গুরুদের নানা তথ্য সমৃদ্ধ ‘সন্ত প্রসাদ’ নামেও একটি বই লিখেছেন। এই বইটি তিনি লেখেন সিড়িডির সাইবাবার মন্দির দর্শনের পর। ৮৪ বছরের বলাই গৌরব নামে এক বৃদ্ধ এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। এবং সাঁইবাবার একটি কাপড় ও এক জোড়া জুতোও দিয়েছিলেন। রেগের সংগ্রহ করা বিরল সমস্ত জিনিসই বর্তমানে তার ‘সন্ত বাস্তু সংগ্রহালয়ে’ রয়েছে।

# মুদ্রার প্রকারভেদ

# কয়েকটি মুদ্রা ও তার ফল

আশিস পাল

**শিব মুদ্রা বা লিঙ্গ মুদ্রা :**

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক তেমন ভাবে দুটো হাত মিলিয়ে মুঠি পাকান এবং বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে সোজা করুন, বাকি আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে ফাঁস লাগানো থাকবে। একেই বলে লিঙ্গ মুদ্রা।

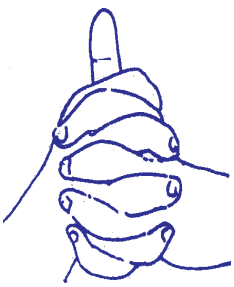

লিঙ্গ মুদ্রা

**উপকারিতা :** এই মুদ্রা করলে শরীরের উষ্ণতাকে বাড়ায়। ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধি করে। সর্দি ও শ্লেষ্মা হ্রাস করে। দেহের চর্বি কমায়। হাঁপানী ও সাইনাস এমন কী নিম্ন রক্তচাপে এই মুদ্রা করলে বেশি লাভ হবে।

**সর্তকতা :** এই মুদ্রা করলে জল, ফল, ফলের রস, ঘি, দুধ বেশি মাত্রায় খাওয়া উচিত। এই মুদ্রা বেশি সময় ধরে করা উচিত নহে।

**শঙ্খ মুদ্রা :**

ছবিতে যেমন ভাবে দেখানো হয়েছে তেমন ভাবে করতে হবে। করতলের বুড়ো আঙুলকে ডান হাতের মুঠের মধ্যে বদ্ধ করে বাঁ হাতের তর্জনী (বুড়ো আঙ্গুলের পাশের আঙ্গুলের নাম তর্জনী) এটিকে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে মেলালেই শঙ্খ মুদ্রা হয়।

**উপকারিতা :** এই মুদ্রা নিয়মিত অভ্যাসে নাভি এবং থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ দূর হয়। পেটের সমস্ত দোষ দূর হয়।

আমাদের শরীরে পাঁচ প্রকার বায়ু আছে। সেইগুলি হলো— (১) প্রাণ বায়ু ঃ হৃদয় থেকে নাসিকা। (২) আপান বায়ু ঃ নাক থেকে পা। (৩) ধ্যান বায়ু ঃ সম্পূর্ণ শরীর।

শঙ্খ মুদ্রা

(৪) উদান বায়ু ঃ কণ্ঠ থেকে মুখমণ্ডল (নাক, কান, গলা)। (৫) সমান বায়ু ঃ নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত চলে (পাচন ক্রিয়া)।

**ধ্যান মুদ্রা :**

তর্জনী, মধ্যমা, অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাগ স্পর্শ করলে এই মুদ্রা হবে, শেষ দুই আঙ্গুল সোজা থাকবে।

ধ্যান মুদ্রা

**উপকারিতা :** অগ্নি বায়ু আকাশ তত্ত্বের বিকাশ হয়। উচ্চ ও নিম্ন রক্তচাপ রোগীর ক্ষেত্রে এই মুদ্রা খুব লাভদায়ক। এছাড়া হৃদপিণ্ডের যাদের সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রেও লাভদায়ক। শুধু তাই নয় কফ, বায়ু পিত্তের সঞ্চালন (Balance) ঠিক হয়।

**উদান মুদ্রা :**

তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগ এর সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ স্পর্শ করলে উদান মুদ্রা হয়, কনিষ্ঠা আঙ্গুল সোজা থাকবে।

**উপকারিতা :** থাইরয়েড সম্বন্ধীয় সব রোগেতে লাভ হয়। মস্তিষ্ক ও মন দুই প্রভাবিত হয়। বুদ্ধির বিকাশ হয়। স্মরণশক্তি ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে, মন শান্ত হওয়ার ফলে মানসিক স্থিরতা বাড়ে।

**সমান মুদ্রা :**

এই মুদ্রাকে সুকরী মুদ্রা অথবা সমন্বয় মুদ্রা বলে। নিজ হাতের চার অঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে অঙ্গুলির অগ্রভাগ মিলালে সমান মুদ্রা হয়। দিনে ৫ বার ৫ মিনিট পর্যন্ত, এর বেশি না করা।

**উপকারিতা :** যেখানে ব্যথা সেখানে সমান মুদ্রা দ্বারা হাত রাখা তা হলে ব্যথার জন্য উপকার পাবেন। যদি শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়, তাহলে ২-৩ ইঞ্চি কাঁধের নীচে ডান হাত থেকে ডান কাঁধের বুকের কাছে এনে বা হাত দিয়ে বা কাঁধের নীচে বুকের কাছে সমান মুদ্রায় রাখা। বিশেষ করে পাচন শক্তি বাড়ে। শুক্র গ্রন্থি শক্তিশালী করে।

**কোন মুদ্রার দ্বারা কোন রোগ নিরাময় হয়**

(১) ওজন কমার জন্য—সূর্য মুদ্রা (২) সাইটিকা, সালিলাইটিস— বায়ুমুদ্রা। (৩) হার্ট-এর রোগ—অপান বায়ুমুদ্রা। (৪) মুধমেহ বা ডায়াবেটিজ—অপানমুদ্রা-প্রাণমুদ্রা। (৫) সর্দি বা কফ—অগ্নিমুদ্রা। (৬) দুর্বলতার জন্য—আকাশমুদ্রা। (৭) নিদ্রা যাদের হয় না— জ্ঞানমুদ্রা-প্রাণমুদ্রা। (৮) পচন ক্রিয়া—শঙ্খমুদ্রা-অপানবায়ুমুদ্রা। (৯) ক্রোধের জন্য—ধ্যান মুদ্রা—শান্তমুদ্রা। (১০) পায়ের হাঁটুর ব্যথা—বজ্রাসনে বায়ুমুদ্রা। (১১) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য—অপানমুদ্রা। (১২) শ্বাসকষ্ট বা সিড়িতে চলতে কষ্ট হলে—অপান বায়ুমুদ্রা।

# স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ সমিতি
## পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অনুষ্ঠান

**রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক॥** বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর তত্ত্বাবধানে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন সারাদেশ জুড়ে শুরু হয়েছে। সমাজে তাঁর পথনির্দেশ কার্যকর করার লক্ষে বিবেকানন্দপ্রেমী অনেক সংগঠনের সহযোগিতায় বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামানে ৪২টি আয়োজন সমিতি ইতিপূর্বে গঠিত হয়েছে ও কার্যকর্তাদের কর্মপ্রশিক্ষণ কর্মশালাও সম্পন্ন হয়েছে। এইসব প্রশিক্ষণ শিবিরে ২০০০-এর বেশি কার্যকর্তা (পুরুষ ও মহিলা) অংশগ্রহণ করেছেন। গত ২৫ জানুয়ারি কলকাতাস্থিত ঐতিহাসিক 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' সভাগৃহে সমাজের প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে নির্মিত হয়েছে ১৩৫ জনের প্রাদেশিক সমারোহ সমিতি। সমারোহ সমিতির বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো—

**উপদেষ্টামণ্ডলী**

**উপাচার্য :** পূজ্যপাদ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড়মঠ। ডঃ সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রফেসর রঞ্জন চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

**প্রাক্তন উপাচার্য :** প্রফেসর সুভাষ চন্দ্র সাহা, অসম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ চিন্ময় গুহ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রফেসর

স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ

অমিতা চট্টোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়।

**বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ :** বাসব চৌধুরী, রেজিস্ট্রার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রফেসর শিবাজী রাহা, নির্দেশক বসু বিজ্ঞান মন্দির।

প্রফেসর সুদীপ্ত ঘোষ, বিভাগীয় প্রধান, আই আই টি খড়গপুর বোর্ড মেম্বার, ভক্তিবেদান্ত ইনস্‌টিটিউট্ (ISKCON)। অধ্যাপক প্রবীর রায়, সাহা ইনস্‌টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ভাটনগর পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী।

**সাহিত্যিক :** সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

## সমাবেশ সমাচার

**প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি :** সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, ওড়িশা উচ্চন্যায়ালয়। চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, মুম্বাই উচ্চন্যায়ালয়। রণেন্দ্র নারায়ণ রায়, এলাহাবাদ উচ্চন্যায়ালয়।

সর্বভারতীয় নির্দেশ ও প্রাদেশিক যোজনানুসারে এযাবৎ সম্পন্ন কিছু কার্যক্রম হলো এরকম :

**পূজামণ্ডপ :**

(১) বিগত শারদোৎসব তথা দুর্গাপূজার সময় বাংলার শতাধিক ক্লাব (১২টি জেলা ও কলকাতা-হাওড়া) সার্ধশত সমিতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের পূজামণ্ডপ ও সাজসজ্জাতে কন্যাকুমারীর শিলা স্মারক মন্দির, বেলুড় মঠ, স্বামীজীর জন্মভিটাসহ বিভিন্ন ধরনের স্বামীজীকেন্দ্রিক প্যান্ডেল ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। পরবর্তীকালে ২১ ডিসেম্বর সমিতি বাছাইকরা ২৫টি পূজাপ্রতিষ্ঠানকে একটি বিশেষ 'বিবেকানন্দ শারদ' পুরস্কার ২০১২, নামাঙ্কিত আকার্ষণীয় সি ডি এবং পুরস্কার সামগ্রী প্রদান করা হয়। ওই পুরস্কার বিতরণী সভাতে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

**সংকল্প দিবস :**

(২) কেন্দ্রীয় নির্দেশানুসারে ২৫ ডিসেম্বর ২০১২ সারাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবাংলাতেও বিশেষ 'সংকল্প দিবস' পালিত হয়। পশ্চিমবাংলাতে মোট ৩১২ স্থানে ১১,৪৭৩ জন ব্যক্তিগতভাবে সংকল্প গ্রহণ করেন যার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৫১৭০ জন।

**সামূহিক সূর্যনমস্কার যজ্ঞ :**

(৩) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি একই দিনে সামূহিক সূর্যনমস্কার যজ্ঞের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৫৯ স্থানে ৩৫১৪৯ জন এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। মূলত ছাত্র-ছাত্রীরাই ছিলেন অংশগ্রহণকারী। ছাত্রী ছিলেন ৮৪৫৭ জন।

**আলোচনা সভা :**

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নন্দন পরিসরে জীবনানন্দ সভাগৃহে কলকাতার সম্বর্ধিনী বিভাগের (মহিলা) ৩৫ জন বিশিষ্ট মহিলার উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়।

**যুব সমাবেশ :**

এছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (দক্ষিণবঙ্গ) ও সমারোহ সমিতির (উত্তরবঙ্গ) উদ্যোগে যুবকদের ২টি বিশাল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। একটি কল্যাণীস্থিত গয়েশপুরে ৩ দিনের (১১-১৩ জানুয়ারি) যুব শিবির যাতে ২১০২ স্থান থেকে ৯১১৫ জন যুবক অংশগ্রহণ করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি মালদহ শহরে একদিনের যুব সমাবেশে মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলার ৯০০ স্থান থেকে ৬৫০০ জন যুবক অংশগ্রহণ করেন। এই সমাবেশে যুবকদের পথনির্দেশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। প্রায় ৫০টির অধিক মঠ-মন্দির, আশ্রম থেকে আগত শতাধিক পূজ্য সন্ত মহাত্মা, অন্য সঙ্ঘ অধিকারীগণ ও সমাজের প্রবুদ্ধ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিত যুব সমাবেশগুলিকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করতে সমর্থ হয়।

উল্লেখ্য, আগামী ১ থেকে ১৫ এপ্রিল স্বামীজীর সুদৃশ্য একটি চিত্রসহ তিনি ধরনের পুস্তক—(১) বাণী ও জীবনী, (২) ভারত জাগো, (৩) উত্তিষ্ঠত জাগ্রত— সামগ্রী নিয়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারের এক ব্যাপক 'গৃহ সম্পর্ক' কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১৩৫ জনের পূর্ণাঙ্গ সমারোহ সমিতির এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩১ মার্চ বেলা ৩টা থেকে ৫টা বিবেকানন্দ সোসাইটির সভাগৃহে।

## ত্রিপুরায় সূর্যনমস্কার দিবস

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত জন্মজয়ন্তী সমারোহ সমিতির উদ্যোগে সমগ্র ভারত ব্যাপী কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরাতেও বল-বীর্য ও সুস্বাস্থ্যের প্রতীক স্বরূপ সূর্যনমস্কার দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় সহস্রাধিক যুবক-যুবতী এই কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে।

# উজ্জয়িনীতে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য উৎসব

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে হয়ে গেল বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যোৎসব। গত ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনদিনের সংস্কৃত সাহিত্যোৎসবের আয়োজক রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান। সহযোগী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত একাডেমী, সংস্কৃত সম্বর্ধনা প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃত ভারতীর মতো প্রতিষ্ঠিত সংস্থা।

সংস্কৃত সাহিত্যোৎসবের উপলক্ষে প্রায় পনের'শ বর্গমিটার ক্ষেত্র জুড়ে তৈরি হয়েছে তিনটি বিশাল 'ডোম' বা অত্যাধুনিক তাঁবু। প্রত্যেকটি 'ডোম' এইভাবে তৈরি হয়েছে যেখানে একসঙ্গে পনের হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে কার্যক্রম দেখতে পারেন। তিনটি 'ডোম'-এর একটিতে পুস্তক মেলা, অন্যটিতে সংস্কৃত-বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও অপরটি সাহিত্যোৎসবের উদঘাটন, সমাপন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের জন্য তৈরি হয়েছিল। এছাড়া ছিল আদর্শ সংস্কৃত গ্রাম, সংস্কৃত বাজার, সংস্কৃত পাঠশালা, সংস্কৃত ক্রীড়াঙ্গন।

সংস্কৃত সাহিত্যোৎসবের উদ্বোধন করেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিরাজ সিংহ চৌহান। কয়েক হাজার সংস্কৃত বিদ্বানদের সমাবেশে তিনি বলেন, সংস্কৃত থেকে সংস্কৃতি রক্ষা হয় আর সংস্কৃতি

থেকে রক্ষা পায় দেশ। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে 'জনভাষা' করার আহ্বান জানান। এই কাজকে রূপায়িত করতে খুব শীঘ্রই মধ্যপ্রদেশের বিদ্যালয়গুলিতে বারো হাজার সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত করার কথা তিনি ঘোষণা করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী অর্চনা চিটনীস্। তিনি কমপিউটার দ্বারা প্রায় দুই শতাধিক নতুন সংস্কৃত পুস্তকের লোকার্পণ করেন যা বিশ্বের ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। এছাড়া প্রায় পঁচিশটি সংস্কৃত সিডি ও ডিভিডির উন্মোচন করা হয়।

প্রায় পঞ্চাশের বেশি প্রকাশক নব্বইটির অধিক বুকস্টলের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য শব্দকোষ, ব্যাকরণের সমস্ত প্রকারের পুস্তক, ছোট গল্প, উপন্যাস ছাড়াও গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ ও বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃত সিডি ও ডিভিডির সমাহার, যা এক কথায় পুস্তক মেলার রূপ নিয়েছিল। প্রকাশক সঙ্ঘের সভাপতি জানিয়েছেন তিনদিনে দেড় কোটি টাকার সংস্কৃত পুস্তক বিক্রয় হয়েছে।

ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান যে সংস্কৃতের উপর আধারিত তার প্রমাণ হিসাবে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রামাণ্য তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়েছে এক বিরাট প্রদর্শনীর মাধ্যমে। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিজ্ঞান, তন্ত্রশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ অবগত করানো হয়েছে বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে। আদর্শ সংস্কৃত গ্রাম কেমন হবে— তার এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সব মিলিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যোৎসব যেন সংস্কৃত মেলায় পরিণত হয়েছে। মাত্র এগারো বছরের সংস্কৃত ভাষী বালক শ্রী চমু শিবশাস্ত্রী বংশীবাদনে দর্শকদের অবাক করে তার সাধনার পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, এই বয়সে আটটি ভারতীয় ভাষায় কথা বলায় সে সমান পারদর্শী।

কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি এন শ্রীকৃষ্ণ, বিচারপতি মুকুন্দরাম শর্মা, রাজ্যসভার সদস্য বিচারপতি ড. রামা জয়েস, গুজরাট সোমনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর বেম্পটি কুটুম্ব শাস্ত্রী, পাণিনি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মিথিলা প্রসাদ ত্রিপাঠী, মধ্যপ্রদেশের সংস্কৃত মন্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত শর্মা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

# শঙ্খনাদ সমরসতা মিশনের অনুষ্ঠান

সম্প্রতি শঙ্খনাদ সমরসতা মিশনের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে সুকান্ত ভবনে একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বাল্মীকি সমাজের তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকনাথজী বলেন, মোগলদের কাছে অত্যাচারিত হয়েও হিন্দুরা ধর্মত্যাগ করেনি, বরং মলবহনের মতো ছোট কাজও স্বীকার করেছে। অথচ সামান্য লোভের কারণে তারাই আজ খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। সব মানুষকে আপন করে কাছে টেনে নিলে জাতি শক্তিশালী হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ

কৃষ্ণগোপালজী বলেন, মাহার, ভংগী ইত্যাদি জাতিরা ইসলাম, খৃস্টান বা কম্যুনিস্ট যাতে না হয়ে যায়, সেজন্য ডঃ আম্বেদকর নিজে এরকম লক্ষাধিক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

কলকাতা পুরসভায় সাফাই বিভাগের কর্মচারী এবং তথাকথিত দলিত সমাজের পরিমল নায়ক নিজের অর্জিত অর্থ দিয়ে ৫ কাটা জমি কিনে শঙ্খনাদকে দিয়েছেন। তাঁকে এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয়। হিন্দু সমাজে যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন হচ্ছে এটা তার এক উজ্জ্বল উদারণ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, বালকৃষ্ণ লুন্ডিয়া, জয়গোপাল গুপ্তা, আশুতোষ পাণ্ডে, সুজিত বাল্মীকি প্রমুখ।

# ইন্টারন্যাশনাল মিশনের সচেতনতা শিবির

দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইমস্চ)-র উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত 'অমিয়বালা বালিকা বিদ্যালয়ে' ৩৩তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা, নিয়ন্ত্রণ সক্রিয় অভিযান এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য, শিশুর পরিবেশ, পরিপূরক খাদ্য, পুষ্টি পরিষেবা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩২৩ জন মা, শিশু, বৃদ্ধ, কিশোরী, শিক্ষক, শিক্ষিকা অংশ নেয়। শিবিরে অংশগ্রহণকারী সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ঔষধ বিতরণ করা হয় এবং মহিলাদের পুষ্টি সহায়তা ও নবজাত শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য, শিক্ষা সহায়তা করা হয়। এরকম শিবির উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত জৌনপুর জেলা অধীন 'শাহগঞ্জ' এবং 'কেড়াকট' 'দেওরিয়া' জেলা অধীন 'রুদ্রপুর' এবং 'সেলিমপুর' গ্রামে আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৫১৬ জন গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং গ্রামবাসী অংশ নেয়। শিবিরে মিশনের মহাসচিব দেবাশীষ ঘোষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন যে, থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয়ই একমাত্র হাতিয়ার। শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব কুমারী মলি বাগ্চী, ডাঃ কৃতি রায়, ডাঃ মানস বিশ্বাস, অজিত পাল, কুমারী রুমা ঘোষ, স্বামী নিত্যানন্দ পুরি মহারাজ, স্বামী সেবানন্দ গিরি মহারাজ প্রমুখ।

# বেহালা বেনীনীবাগান সমিতির অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে 'বেহালা বেনীনীবাগান ওয়েলফেয়ার সমিতি' গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছিল। উত্তর কলকাতার 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি'র সম্পূর্ণ সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই শিবিরে প্রায় ১৫০ জন ব্যক্তির চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। ওইদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও উদ্যোক্তাদের ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে সুষ্ঠুভাবে শিবিরের কাজ সম্পন্ন হয়। এই সমিতির তরুণ সদস্যদের প্রচেষ্টায় এই ধরনের অনুষ্ঠানের ফলে এলাকার অধিবাসীরা যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছেন। এছাড়া গত ২৬ জানুয়ারি স্থানীয় কমলা শিশু উদ্যানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সূচনা করেন সমিতির সভাপতি দুলাল চন্দ্র দাস। সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্থানীয় অধিবাসীরা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর ১৫ ফেব্রুয়ারি, সকালে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সহকারে বাগ্দেবীর আরাধনা অনুষ্ঠিত হয়। এ দিনের সান্ধ্য অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণরূপে 'আমাদের স্বামীজী' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা মঞ্চস্থ করা হলো। পরে 'সরস্বতী বন্দনা' নামে একক নৃত্যানুষ্ঠান ও স্বামী বিবেকানন্দের উপর 'ক্যুইজ প্রতিযোগিতা' হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট অতিথি যথা— অলোক চ্যাটার্জী, তপন গাঙ্গুলী, তপন চ্যাটার্জী, অশোক চ্যাটার্জী, সমরেন্দ্র চন্দ, দুলাল দাস প্রমুখ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন।

# আলুচাষী কল্যাণ মঞ্চ

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে গঠিত আলুচাষী কল্যাণ মঞ্চ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের আলুচাষীদের সমস্যা সমাধানের জন্য তিন দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন করে চলেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি

বর্ধমান জেলার জামালপুর বি ডি ও অফিসে নিম্নলিখিত তিনটি দাবীর সমর্থনে এক ডেপুটেশন দেন জামালপুর শাখার কৃষকবন্ধুরা। তাদের দাবিগুলো হলো—

১. আলুর সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য কিলো প্রতি আট টাকা করতে হবে। ২. সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে আলু কিনতে হবে। ৩. আলুচাষীদের সচিত্র পরিচয় পত্র দিতে হবে।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সংগঠক সুব্রত মণ্ডল, অর্ধেন্দু ঘোষ, প্রবীর ঘোষ, শম্ভুনাথ নায়েক প্রমুখ। বিভিন্ন বক্তারা আলুচাষীদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

সুব্রত মণ্ডল বলেন যে আলু আমাদের দেশে ৩নং খাদ্যবস্তু। সরকার যদি ধান, গমের সহায়ক মূল্য ধার্য করতে পারেন তবে এই অপরিহার্য খাদ্যবস্তুটিরও সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা উচিত।

## শোকসংবাদ

সঙ্ঘ প্রচারক তথা বিশ্বহিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকারের মাতৃদেবীর তিরোধান হয়েছে। গত ৫ মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় নিজগৃহে সজ্ঞানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন প্রভাদেবী (৮০ বছর)। ২ পুত্র ও ২ কন্যাসহ অনেক আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের তিনি রেখে গেলেন। তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম সহ পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

## পরলোকে রতন ভট্টাচার্য

**সংবাদদাতা ॥** গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ যেন চলতে চলতে চলে গেলেন রতন ভট্টাচার্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তিনি ছিলেন আমতা মহকুমা সঙ্ঘচালক। সারাদিন স্বাভাবিক কাজকর্ম করার পর বিকেলে হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করেন। ফুলেশ্বর 'সঞ্জীবন' হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়। হাওড়া জেলার আমতার কাছে নারিট গ্রামে এক প্রাচীন পরিবারের বংশধর তিনি। স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, আত্মীয় পরিজন, নাতি-নাতনি এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে তিনি রেখে গেছেন।

আমতা মহকুমার সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সবাই তাঁকে নিজেদের লোক বলে মনে করতেন। তাজপুর গ্রামের শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিউট অফ কালচার, নারিট ও আমতার সরস্বতী শিশুমন্দিরের তিনি ছিলেন পথনির্দেশক। তাঁর পরিবারে তিন শতাধিক বছরের প্রাচীন দুর্গাপূজা এখনও হয়ে আসছে। তাঁদের গ্রাম ও পরিবারের সঙ্গে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রমুখের সম্পর্ক ছিল। ভারতের প্রথম ভারতীয় অ্যাকাউন্ট জেনারেল মন্মথ ভট্টাচার্য তাঁদের পূর্বপুরুষ।

## ডঃ দিবাকর কুণ্ডু প্রয়াত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সহসভাপতি ডঃ দিবাকর কুণ্ডু গত ২ মার্চ পরলোক গমন করেছেন। তিনি গত কয়েক বছর দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। তিনি স্ত্রী, এক কন্যা, আত্মীয়স্বজন ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। কলকাতায় টালা এলাকায় সঙ্ঘের কাজের বিস্তারে তাঁদের পরিবারের অবদান সকলে স্বীকার করেন। তাঁর নেতৃত্ব ও বাগ্মিতার জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁর প্রয়াণে সঙ্ঘ পরিবারের সকলেই শোকাহত এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

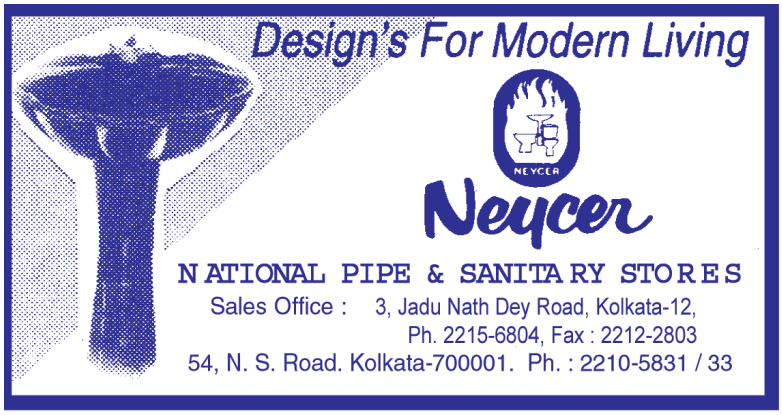

**শব্দরূপ-৬৬১** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

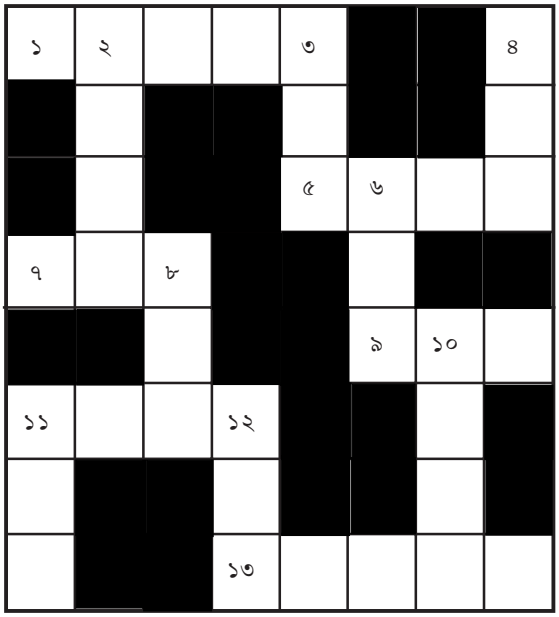


**সূত্র :**

**পাশাপাশি : ১.** যার রূপ-লাবণ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না, **৫.** পদাতিক সৈন্য, **৭.** ধাতু সম্বন্ধীয়, **৯.** এই পাহাড় থেকে মত্ত হাতির দল প্রায়ই লোকালয়ে ঢুকে পড়ে, **১১.** রাবণের ভগিনী, লক্ষ্মণ যার নাক কেটেছিলেন, **১৩.** মুনি বিশেষ, তাঁর পত্নী সর্পরাজ বাসুকির ভগিনী।

**উপর-নীচ : ২.** দেবতার সেবক পূজারী, **৩.** সগর বংশধ্বংসকারী মুনি, **৪.** ''—মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে'', **৬.** ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি, **৮.** সমুদ্রের অধিপতি দেবতা, **১০.** নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার, **১১.** সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচয়িতা, **১২.** রাগিণী বিশেষ; একে-দুয়ে থাম, খুঁটি।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৬৫৮**
**সঠিক উত্তরদাতা**
**শৌনক রায়চৌধুরী**
**কলকাতা-৯**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ধূ | ত | রা | ■ | অ | ল | স |
| ■ | প | ■ | মা | ■ | শ | ■ | হা |
| ব | ■ | ■ | নু | রা | নি | ■ | স্য |
| স | র | সি | জ | ■ | ■ | ■ | ব |
| ন্ত | ■ | ■ | ■ | ক | লা | বি | দ |
| প | ■ | দ | ধী | চি | ■ | ■ | না |
| র | ■ | নু | ■ | কাঁ | ■ | ঠা | ■ |
| ব | র | জ | ■ | চা | মু | ণ্ডা | ■ |

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

□ ৬৬১ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ এপ্রিল, ২০১৩ সংখ্যায়

*ধর্মই আমাদের শোণিত স্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এই রক্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতি সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমনকি আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্যদোষ— সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে।*

*— স্বামী বিবেকানন্দ*
*(বাণী ও রচনা, ৪/১৮৪)*

*সৌজন্যে : জনৈক শুভানুধ্যায়ী*

# ভারতীয় দলে ফের দোলা ব্যানার্জী

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১০ গুয়াংজৌ এশিয়াডের পর খারাপ ফর্মের জন্য ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ে গেছিলেন তিনি। তবে হাল ছাড়বার পাত্রী নন দোলা ব্যানার্জি। ৩১ বছর বয়সটাও এমন কিছু বেশি নয়। অন্তত তিরন্দাজি, স্যুটিংয়ের সাপেক্ষে। এই দুটি খেলায় অনেক বেশি বয়সে অলিম্পিক খেলার নজির রয়েছে বিদেশে। এদেশেও ডঃ কার্নি সিং পঞ্চাশোর্ধ বয়সে রোমে বিশ্বস্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে গিয়ে রূপো জিতেছিলেন। জয়পুর রাজপরিবারের সদস্য কার্নি সিং ভারতীয় ক্রীড়া জগতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তার ছেলেও বিখ্যাত স্যুটার এশিয়াডে পদকজয়ী রাজা রণবীর সিং যিনি দীর্ঘদিন ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার মহাসচিব।

দোলা ব্যানার্জি অবশ্য কোনও রাজপরিবার কেন, সচ্ছল পরিবারেরও সন্তান নন। বরাহনগরের সাধারণ ছাপোষা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে ২০০৭-এ লন্ডনে বিশ্ব তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বিভাগে চাম্পিয়ন হয়েছেন।

বিশ্বকাপ জেতাটাই দোলার জীবনে সর্বোত্তম কীর্তি। তারপর কমনওয়েলথ গেমসে (দিল্লী, ২০১০) থেকেও দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। তবে ২০০৪ আর ২০০৮ পরপর দুটি অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি দেশবাসীর। অবশ্য কোন তিরন্দাজই বা পেরেছেন। স্বয়ং লিম্বারাম দুনিয়া জোড়া সাফল্য পেয়েও অলিম্পিকে ব্যর্থ। এবারও লন্ডন অলিম্পিকের আগে দোলার ভাই রাহুল ব্যানার্জি বিশ্বর‍্যাঙ্কিং-এ এক নম্বরে থাকা দীপিকা কুমারীকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখা হয়েছিল। দলগতভাবেও ভারতকে নিয়ে আশাবাদী ছিলেন মিডিয়া থেকে ক্রীড়াজগতের মানুষজন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম একটা ব্রোঞ্জও জুটল না। অথচ অলিম্পিকের সমমানের নানা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ভারতীয় তিরন্দাজরা ঝুড়ি ঝুড়ি পদক জেতেন। দোলা ব্যানার্জিও এর ব্যতিক্রম নন। ইদানিং দোলা সল্টলেক আই সেন্টারে প্রচুর পরিশ্রম করছেন। পরিশ্রমের ফলও পেয়েছেন হাতে নাতে। জাতীয় পর্যায়ের সব টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক সাফল্য পেয়ে আবার জাতীয় নির্বাচকদের গুডবুকে দোলা। ফলস্বরূপ ব্যাঙ্ককে আসন্ন এশিয়ান গ্রাপ্রি টুর্নামেন্টে ফের জাতীয় দলে দেখা যাবে দোলাকে। এবছর বিশ্বজনীন কোনও টুর্নামেন্ট নেই। এরকম গ্রাপ্রি টুর্নামেন্ট আর বিশ্বকাপ রয়েছে। পরের বছর এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস। এশিয়ান গেমসের মান অলিম্পিকের প্রায় সমতুল্য। দোলা নিজে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সাইয়ে অনুশীলনের পর সে এশিয়াড পদক জিতে তিরন্দাজিকে বিদায় জানাতে চান। কারণ অলিম্পিক পদক তার পক্ষে আর জেতা সম্ভব নয়। তাই এশিয়াডই লক্ষ্য। এর আগে বিশ্বচাম্পিয়ন শিপ জিতেছেন। এশিয়াড পদক জিতলে তা হবে মধুরেণ সমাপয়েত। তার জন্য এবছর সবকটা গ্রাপ্রি টুর্নামেন্টে ভাল ফল করতে হবে।


Ori Plast

**P.V.C. Threaded Pipes.** For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

***Authrorised Distributor :***

**NATIONAL PIPE & SANITERY STORES**

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

**PARTHA SARATHI CERAMICS**

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
18 March - 2013


# FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

**CENTURYPLY**
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

**CENTURYVENEERS**
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

**CENTURYLAMINATES**
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
**CENTURYMDF**
**CENTURYPRELAM**

CENTURYPLY®


দাম : ৭.০০ টাকা